# কিছুক্ষণ

"বনফুল"

॥ শ্রীগুরু লাইব্রেরী ॥
॥ কলিকাতা : ছয় ॥

অগ্রগামী কবি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু—

ভাগলপুর

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

# কিছুক্ষণ

১

সময়ের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে।

সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, জন্ম-জীবন-মৃত্যু সব চলিয়াছে। কত আশা-নিরাশা, আনন্দ-অবসাদ, স্তুতি-নিন্দা, সুন্দর-কুৎসিত, কালস্রোতের ঘূর্ণাবর্তে লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে। অদৃশ্য ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করিয়া—কিংবা হয়তো লক্ষ্য না করিয়াই—নিখিল বিশ্ব ভাসিয়া চলিয়াছে।

আমিও চলিয়াছি।

গরুর গাড়ির গাড়োয়ানটাকে বলিলাম, তুই ট্রেনটা ফেল করাবি দেখছি—একটু হাঁকিয়ে চ। ফলে সে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিয়া মন্থরগতি বলীবর্দযুগলকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিল। গতিবেগ সামান্য একটু বাড়িল বটে, কিন্তু তাহা এমন নয় যে, নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বন্ধুর গ্রাম্য পথ।

যতদূর দৃষ্টি চলে, চাহিয়া আছি। চোখে পড়িতেছে দূরে তালগাছের সারি। ঋজু বলিষ্ঠ দেহ লইয়া আকাশের বুকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য আঁকিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের আশপাশের ঘনসন্নিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণীকে এতদূর হইতে চেনা যায় না। নগণ্য জনতার মত উহারা দিগন্তরেখাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। ডান দিকের একটা ঝোপ হইতে একটা শৃগাল হঠাৎ বাহির হইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ আমাদের সাড়া পাইয়া সচকিত হইয়া ছুট দিল। সঙ্গে

সঙ্গেই দেখি আর একটা। গাড়োয়ান গরু দুইটিকে আর একবার সম্ভাষণ করিয়া আমাকে বলিল, গতিক ভাল লয়।

কিসের গতিক ?

দু-দুটো গিয়ে শেয়াল ডান দিকেই, লক্ষণ ভাল লয়।

তাই নাকি ?

লয় তো কি, কাগ, শেয়াল আর সাপ—এ তিনটি জানোয়ার ভারি ইয়ে জানবেন আপনি। হনুমানও বটে।

বাজে। কলিকালে ওসব আর ফলে না।

গাড়োয়ান খানিকক্ষণ কিছু বলিল না।

বোধ হয় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ গরুর পিঠে এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিয়া সে কহিল, আমার হাতে হাতে ফল দেখা আছে। শোনা কথা লয় যে, বলব ইয়ে—আরে, ই শালার বয়েলটাও একের লম্বর হারামজাদ।—বলিয়া সে বলদটার পৃষ্ঠদেশে সশব্দে আর এক ঘা বসাইয়া দিয়া শুরু করিল।

তাহার কাহিনী এই যে, প্রায় বৎসর-খানেক পূর্বে সে লবাইগঞ্জের হাট হইতে মথুর মাঝির সঙ্গে ফিরিতেছিল। ফিরিবার পথে ঠিক তাহার বাঁ পাশ ঘেঁযিয়া প্রকাণ্ড একটা সাপ চলিয়া যায়। সে সাপ তাহার গণেশকেই লইতে আসিয়াছিল, তাহা সে তখন জানিতে পারে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, গণেশ কে ?

আমার ছেলে বাবু। ইয়া দামাল দুরন্ত ছেলে ছিল আমার গণেশ।

তাকে সাপে কামড়ে দিলে নাকি? সঙ্গে ছিল তোমার?

সঙ্গে থাকবে কিসের লেগে? বলছিলাম না আপনাকে, ভারি বিতিকিচ্ছি জানোয়ার ওগুলা। বাড়ি যেতে না যেতেই শুনলাম, গণশার অসুখ—পেট নামছে, বমিও খুব। পহর-খানেক রাত হতে না হতেই সব খতম। ওসব কলেরা-মলেরা আমি বুঝি না বাবু, লিয়তি ওকে টানছিল। চ, চ বাবা, আর একটুকুন বাকি—একটু চ'লে চ—

গাড়োয়ানের কর্কশ স্বর কোমল হইয়া আসিয়াছিল। গরু দুইটি তাহার শোকের সুযোগ লইয়া যতদূর সম্ভব মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। আমিও খানিকক্ষণের জন্য ভুলিয়া গেলাম যে, এই ট্রেনটা আমার ফেল করা চলিবে না। কাল আমার কলেজ খুলিবে এবং আমার পার্‌সেন্‌টেজ টায়ে টায়ে আছে। গাড়ির ছইয়ের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া সামনে পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, একজোড়া খঞ্জনপক্ষী পুচ্ছ দোলাইয়া পথের ধারে চরিয়া বেড়াইতেছে।

## ২

ট্রেন ছাড়ে নাই।

আমার ট্রেন আসেই নাই। শীঘ্র আসিবার সম্ভাবনাও ছিল না। শৃগালদর্শনের ফল হয়তো। পশ্চিমগামী একখানা গাড়ি লাইনচ্যুত হইয়াছে। এ গাড়িখানা না উঠিলে অন্য

কোন গাড়ি আসা অসম্ভব। সমস্ত ট্রেনখানার যাত্রীরা সেই ক্ষুদ্র স্টেশনটির প্ল্যাট্ফর্মে নামিয়া এক বিচিত্র জনতার সৃষ্টি করিয়াছে। আমিও গিয়া তাহাদের দলে যোগ দিলাম। অপরিচিত জনতা!

একটি লোকও আমার চেনা নয়।

নিজের বিছানা ও সুট্‌কেসটি স্টেশনের কোথায় নিরাপদে রাখা যায় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় টেলিগ্রাফ-অপারেটর-বাবুটি সহাস্যমুখে আমাকে সম্বোধন করিলেন, এই যে সার্, আপনিও জুটে গেছেন দেখছি! এই ট্রেনে যাচ্ছিলেন বুঝি?

যেতে আপনারা দিচ্ছেন কই? আপাতত এ জিনিসগুলো কোথায় রাখি, বলুন দেখি? চারিদিকে যা ভিড়—

এই যে এখানে রেখে দিন না।—বলিয়া তিনি তাঁহার আপিসের একটা কোণ দেখাইয়া দিলেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ছিল।

ছুটির প্রারম্ভে যখন মামার বাড়ি আসিতেছিলাম, তখন গাড়িতে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। সিগারেট আদান-প্রদান করিতে করিতে আলাপটা ঘনিষ্ঠই হইয়াছিল। মনে পড়িতেছে, সেই স্বল্প আলাপের মধ্যেই জানিতে পারিয়াছিলাম যে, ভদ্রলোকের পরিবারের নাম বিনোদিনী এবং তিনি স্বামীর কাছে আসিয়া থাকিতে উৎসুক; কিন্তু রেল-কোম্পানি এমন কৃপণ যে, কিছুতেই ভাল একটা কোয়ার্টার তাঁহাকে দিতেছে না। ভদ্রলোকের নাম মাখনলাল। বেশ মন-খোলা

লোক। প্রায় মাস-খানেক পূর্বে একদা উভয়ে এই স্টেশনে নামিয়াছিলাম। মাখনবাবু আসিয়া কাজে জয়েন করিয়াছিলেন এবং আমি মামার বাড়ি চলিয়া গিয়াছিলাম। এই অপরিচিত জনতার মধ্যে মাখনবাবুকে পাইয়া এবং তাঁহার ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া ভাল লাগিল।

নিকটস্থ টুলটিতে উপবেশন করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিয়া ট্রেনটা হঠাৎ এমন ভাবে পড়িয়া গেল?

মুচকি হাসিয়া মাখনবাবু বলিলেন, গাঁজা—অর্থাৎ আমাদের রামদীনের কীর্তি।

রামদীন কে?

পয়েণ্ট্‌স্‌ম্যান।

পয়েণ্ট্‌স্‌ম্যান গাঁজা খেয়ে এই কীর্তি করেছে? বলেন কি মশাই?

গলা খাটো করিয়া মাখনবাবু বলিলেন, আসল ফ্যাক্ট হ'ল এই। তবে আমরা রামদীনকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। আপনি যেন কথাটা ব'লে বেড়াবেন না।

সহসা টেলিগ্রাফের কলটা টকটক করিয়া উঠিল এবং মাখনবাবু আমার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া টক্কা-টরে শুরু করিয়া দিলেন। তাহার পর হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, সমস্ত দিন ভোগান্তি আছে আজ। রিলিফ ট্রেন সন্ধ্যের আগে পাওয়া যাবে না। আবার কল কথা কহিয়া উঠিল, আবার মাখনবাবু সাড়া দিলেন। আমি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম।

বাহিরে আসিয়া দেখি, স্টেশন-প্ল্যাট্‌ফর্মের কোণে যে জলের কলটা আছে, তাহার সম্মুখে বহু লোকের ভিড়। কয়েকজনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে।

একটি শীর্ণকান্তি লোক তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন। রগের শিরগুলা ফুলিয়া উঠিয়াছে।—এক'শো বার বলব আমি। সেকেন কেলাসের টিকিট আছে ব'লে কি তোমার বাবুর বেশি তেষ্টা নাকি আমাদের চেয়ে? ইস, ভারি সেকেন কেলাস ফলাতে এসেছে আমার! সর বলছি—

ভৃত্য-স্থানীয় একটি ছোকরা একটি প্রকাণ্ড কুঁজায় জল ভরিতেছিল। সে অবিচলিতকণ্ঠে উত্তর করিল, আমার ভরা হোক আগে। হুড়বড় ক'রো না।

চাকরটির গায়ে ফরসা হাত-কাটা ফতুয়া, কানে একটি অর্ধ-দগ্ধ বিড়ি। বেশ চালাক-চতুর চেহারা।

শীর্ণ ভদ্রলোক বলিলেন, তোমার ওই দিগ্‌গজ কুঁজো ভরতে তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে। সর, আমার এই ছোট ঘটিটা ভ'রে নিই আগে।

ভৃত্য কোন জবাব না দিয়া জল ভরিতে লগিল। শীর্ণকান্তি লোকটি বলিতে লাগিলেন, ওহে, কথার জবাব দাও না কেন হে তুমি? আচ্ছা বেল্লিক ছোকরা তো!

মুখ সামলে কথা বলবেন আপনি।

মুখে এক থাবড়া মারব তোমার। ডেঁপো ছোকরা কোথাকার!

এই ভিড়ের মধ্যে কারু বাপের সাধ্যি আছে, আমার গায়ে হাত দিক দিকি !

বাপ তুলে গালাগালি দেবার জায়গা পাও নি আর? ব্যাটাচ্ছেলে, হারামজাদা—

মুখ সামলে কথা বলবেন আপনি।

একজন দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ কাবুলিওয়ালা বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া আগাইয়া গেল এবং এক ঝটকায় ছোকরাকে সরাইয়া দিয়া নিজের বদনা ভরিতে শুরু করিয়া দিল। সেই কাবুলি-ঝটকার প্রাবল্যে যাহা প্রত্যাশিত, তাহাই ঘটিল। কুঁজা ভাঙিয়া গেল এবং ভৃত্য ভূশায়ী হইল। ঠিক সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটিং-রুম হইতে এক আর্ত নারীকণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম, একটি মহিলা নিতান্ত অসহায়ভাবে বলিতেছেন, ওমা, কি হবে গো ! কাবলেটা ছট্টুকে মেরে ফেললে যে গা !

আইনত এইবার আমার পৌরুষ জাগ্রত হওয়ার কথা। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া আমি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। হাসি অবশ্য বেশিক্ষণ টিকিল না, কর্মক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হইতেই হইল।

ওয়েটিং-রুম হইতে একজন বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক বাহির হইলেন। পুরু লেন্সের চশমা পরা। ভদ্রলোক মহিলাটিকে বলিলেন, তুই ভেতরে যা, আমি দেখছি।

বলিয়া তিনি আগাইয়া আসিলেন। আসিয়া "ছট্টু—এই ছট্টু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া অসহায়ভাবে এদিক ওদিক

চাহিতে লাগিলেন। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই একটু আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, বড় মুশকিলে পড়া গেল! বিধবা মেয়েটা কাল থেকে নিরম্বু উপবাসী, অথচ জল যোগাড় করা মুশকিল ব্যাপার দেখছি। ওই কাবলের সঙ্গে যোঝবার সামর্থ্য আমার তো নেই। ওরে ছট্টু, এ ব্যাটা চাকর আচ্ছা বাক্যবাগীশ! আবার কার সঙ্গে বচসা শুরু করেছে!

তখন আমাকে বলিতে হইল, আমাকে একটা কিছু পাত্র দিন তো, চেষ্টা করে দেখি, যদি জল আনতে পারি।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি আমার হাত দুইটি ধরিয়া বলিলেন, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। দেখুন, যদি পারেন। যা ভিড়!

ফিরিয়া দেখিলাম, কাবুলিওয়ালা বেশ স্বচ্ছন্দে সমস্ত কলটা অধিকার করিয়া মুখ-প্রক্ষালন করিতেছে, এবং অন্তত পঞ্চাশজন প্যাসেঞ্জার বিরক্তি-বিদ্রূপ-হতাশার ভঙ্গীতে তাহাকে ঘিরিয়া নানা গ্রামে চীৎকার করিতেছে। ছট্টুও উঠিয়াছে এবং সেই শীর্ণকান্তি লোকটিকে নিকটে পাইয়া বাচনিক বীররসের অবতারণা করিতেছে।

আমি বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে বলিলাম, একটা কিছু পাত্র দিন তা হ'লে।

আসুন।

ভদ্রলোকের পিছু পিছু ওয়েটিং-রুমে ঢুকিয়া অ্যালুমিনিয়মের একটা ঘটি লইয়া কলের দিকে অগ্রসর হইলাম। ভিড় ঠেলিয়া কাবুলিওয়ালার নিকটস্থ হওয়াই মুশকিল। হিন্দু, মুসলমান,

মাড়োয়ারী, বাঙালী, বেহারী সকলেই জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। সকলেরই লক্ষ্য কলটার উপর, কেহই কিন্তু অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। গাড়ুহস্তে এক বেঁটে ভদ্রলোক একটু তফাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আমাকে অযাচিতভাবে উপদেশ দিলেন ও ব্যাটার হয়ে যাক আগে, তারপর এগুবেন মশাই। কেন মিছিমিছি সকালবেলায় গো-খাদক ব্যাটার হাতে মার খেয়ে মরবেন ?

দেখি।

ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম এবং কাহাকেও ঠেলিয়া, কাহারও পা মাড়াইয়া, কাহাকেও অনুনয় করিয়া, কাহারও পাশ কাটাইয়া কাবুলিওয়ালার নিকটস্থ হইলাম। সে তখন তোড়ে কল খুলিয়া দিয়া মাথা ধুইতেছে। আমি কাছে আসিতেই সে আমার ঘটিটার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসুভাবে আমার দিকে চাহিল। চাহিবামাত্র আমি তাহাকে ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে বুঝাইয়া বলিলাম যে, একটি জেনানী অত্যন্ত পিপাসার্ত, তাহার জন্য জল অবিলম্বে প্রয়োজন, সুতরাং কলটা একবার ছাড়িয়া দেওয়া দরকার।

জরুর।

কাবুলিওয়ালা তৎক্ষণাৎ কল ছাড়িয়া দিল। এত অল্প আয়াসে ব্যাপারটা মিটিয়া গেল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কাবুলিওয়ালার প্রতি রাগের ভাবটা কমিয়া আসিল। ঘটি অর্ধেক ভরা হইয়াছে, এমন সময় কাছায় টান পড়িল। ফিরিয়া

দেখিলাম, সেই বেঁটে ভদ্রলোকটি একমুখ হাসিয়া আমাকে বলিতেছেন, এই ফাঁকে আমার গাড়ুটাও ভ'রে দিন না মশাই, আপনাকে যখন ভরতে দিয়েছে। পুলিসে কাজ করেন বুঝি আপনি? হেঁ-হেঁ, তাই—

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমার ঘটি পরিপূর্ণ হইলে সরিয়া দাঁড়াইয়া ভদ্রলোককে বলিলাম, এইবার নিন না। কিন্তু কাবুলিওয়ালা সে সুযোগ তাঁহাকে দিল না। আমি সরিয়া যাইতেই সে আসিয়া কল দখল করিল, এবং বাকি সকলে নিষ্ফল কোলাহল করিতে লাগিল।

ভিড় ঠেলিয়া জলের ঘটিটা লইয়া সন্তর্পণে ওয়েটিং-রুমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বৃদ্ধ দ্বারেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার বিধবা কন্যাও দেখিলাম পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন। আশা করিতেছিলাম, তিনি আমার এই অসাধ্যসাধনে পুলকিত হইয়া আমায় ধন্যবাদ দেবেন, এবং ওই পিপাসিতা বিধবাটি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টির দ্বারাও আমাকে অন্তত পুরস্কৃত করিবেন।

কিন্তু কিছুই হইল না।

বিধবাটি বলিলেন, ও জল আমি খাব কি ক'রে?

ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, কেন?

তারপর হঠাৎ আমার পায়ের দিকে চাহিয়া হতাশভাবে বলিয়া ফেলিলেন, এঃ, সব মাটি হ'ল!

মেয়েটি বলিলেন, তুমি ওঁকে ব'লে দিলে না কেন বাবা, ওঁর কি অত খেয়াল আছে?

আরে বাঃ! হিন্দু বিধবার জন্যে জুতো পায়ে দিয়ে জল আনে নাকি কেউ?

অপরাধী পাদুকাযুগলের প্রতি চাহিয়া আমি একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম।

বৃদ্ধ আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আরে বাঃ, তাতে কি হয়েছে? জলটা অন্য কাজে লাগবে। ভিড়টা কমুক একটু, জল পাওয়া যাবে এখুনি।

কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় সোরগোল করিতে করিতে টেলিগ্রাফ-মাস্টার মাখনলাল আসিয়া হাজির।

আরে মশাই, আপনাকে খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান। হঠাৎ কোথায় ডুব মারলেন? ও কি হাতে জলের ঘটি কেন?

বলিলাম।

মাখন বাবু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তার জন্যে ভাবনা কি? আপনার মেয়ের জন্যে জল-টল সব আমি বাসা থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও কলের আশা ছেড়ে দিন।

তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আসুন আপনি, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

জলের ঘটিটা নামাইয়া দিয়া মাখনলালের অনুবর্তী হইলাম। যাইতে যাইতে মাখন আমাকে কনুই দিয়া এক খোঁচা মারিয়া ভ্রূ নাচাইয়া বলিলেন, কেল্লা মার দিয়া, বুঝলেন? কোয়ার্টার পেয়ে গেছি। ওয়াইফকে এনে ফেলেছি। খান না এখন কত চা খাবেন আপনি।—বলিয়া ভদ্রলোক হো-হো করিয়া হাসিয়া

উঠিলেন। পর-মুহূর্তেই আবার গম্ভীর হইয়া চিন্তিতস্বরে শুরু করিলেন, ট্রেনখানা ডিরেল্ড হয়ে বড় যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে গেল। রামদীনটাকে এনি হাউ বাঁচাতে হবে। আমাদের মাস্টার মশাইও উঠে-প'ড়ে লেগেছেন। দেখা যাক, কতদূর কি করা যায়। ব্যাটা গাঁজা খেয়েই মরেছে কিনা, তা না হ'লে লোক ভাল। ও-ই তো নিজের কোয়ার্টারটা আমায় ছেড়ে দিয়েছে। তা না হ'লে বিন্নুকে আমি আনতে পারতাম নাকি? ব্যাটা গ্রেট সোল। বললে আমাকে, হুজুর, বহুমায়িকো লিয়ে আনেন—আমি টিশনে শুত্‌ব! হামার তো জরু-টরু কোই নেই আছে। ব্যাটা আবার বাংলা বলে। সত্যি, ব্যাটার তিন কুলে কেউ নেই। লোক ভাল। মাটি করেছে ব্যাটাকে গাঁজাতে।

আমি বলিলাম, ছোটবাবুর কোয়ার্টার নেই, অথচ পয়েণ্ট্‌স্‌ম্যানের কোয়ার্টার আছে, এ কি রকম ব্যবস্থা?

কোয়ার্টার থাকবে না কেন? ওই যে দেখুন না, রিপেয়ার হচ্ছে—টিমে তেতালা চালে।—বলিয়া তিনি দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

মাখনবাবুর সহিত কথা কহিতে কহিতে চলিতেছিলাম এবং লক্ষ্য করিতেছিলাম, কত বিভিন্ন জাতীয় যাত্রী এই ছোট স্টেশনটিতে আটকাইয়া পড়িয়াছে।

একটা মেলা বসিয়া গিয়াছে যেন।

ট্রেন লাইনচ্যুত হইয়াছে প্রায় ঘণ্টা দুই হইল। এই

দুর্ঘটনার আকস্মিকতা প্রথমে সকলের মনকে নিশ্চয়ই যথেষ্ট নাড়া দিয়াছিল, এখন দুই ঘণ্টা পরে সে ভাবটা আর নাই। এই দুর্ভাগ্যটাকে মানিয়া লইয়া এখন সকলে খানিকক্ষণের জন্য থিতাইয়া বসিয়াছে। ছোট বড় নানা দলে বিভক্ত হইয়া সকলে নিজ নিজ সুবিধা অন্বেষণে তৎপর হইয়াছে।

আরশোলা-রঙের আজানুলম্বিত গলাবন্ধ কোট গায়ে একটি মাড়োয়ারী সপরিবারে এক স্থানে বসিয়া আছেন, দেখিলাম। হলুদ-রঙের পাগড়ি বহু পাকে পাকানো। মুখে ভীত-বিনীত-চতুর ভাব। চক্ষু চারিদিকে ঘুরিতেছে। গোঁফজোড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কাছেই দুই-তিনজন ঘোমটা-দেওয়া মহিলাও বসিয়া আছেন। হাতে ও পায়ে মোটা মোটা গোল গোল গহনা পরা, পরনে লাল ও হলুদ রঙের ছাপা সস্তা জরির-পাড়-বসানো কাপড়, অঙ্গে প্রায় তদনুরূপ ওড়না। যদিও ঘোমটা দেওয়া, কিন্তু অনর্গল কিড়ির-মিড়ির করিয়া বকিয়া চলিয়াছেন। আমাদের নিকটবর্তী হইতে দেখিয়া মাড়োয়ারী ভদ্রলোক সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেলাম করিলেন এবং মাখনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ট্রেন ঠিক হইতে কত বিলম্ব হইতে পারে?

মাখন বাবু বলিলেন, খবর তো দিয়েছি আমরা। এখন প্রভুরা দয়া করবেন, তবে না সব ঠিক হবে।—বলিয়া মাখনবাবু হাসিয়া আমার দিকে চাহিলেন। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম একদল মুসলমান গোল হইয়া বসিয়া আহারে প্রবৃত্ত

হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে পাঁচ-ছয় বছরের একটি মেয়েকে দেখিয়া বেশ লাগিল। ফুটফুটে সুন্দর মুখখানি, ডাগর চোখ দুইটিতে সুর্মা লাগানো—মাথায় লম্বা বেণী, পরনে কমলা-রঙের ঢিলা পায়জামা, গায়ে ঘন-নীল রঙের আঙরাখা। সর্বদাই ছটফট করিতেছে। আমাকে দেখিয়া অকারণে মুখবিকৃতি করিয়া জিভটা বাহির করিয়া মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল।

একটি কুচকুচে কালো ভারতীয় ক্রিশ্চান সাহেব তাঁহার সুসজ্জিতা মেমসাহেব সহ একটু দূরে তফাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মেমসাহেবটির বর্ণও মর্মান্তিক। তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, যেন তাঁহারা স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া এই দূষিত জনতার মধ্যে কোনক্রমে দয়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সাহেবটির হাতে একটি অর্ধদগ্ধ বর্মা-চুরুট, মেমসাহেবের হাতে একটি ভ্যানিটি-ব্যাগ। মেমসাহেব মুখে প্রচুর পাউডার মাখিয়াছিলেন। এই দারুণ গ্রীষ্মকালে ঘর্মাক্ত কালো মুখে পাউডারের প্রাচুর্য দেখিয়া একটা উপমা হঠাৎ মনে উদয় হয়, যেন মাগুরমাছকে কুটিবার পূর্বে ছাই মাখানো হইয়াছে।

সাহেব একটু আগাইয়া আসিয়া মাখনবাবুকে প্রশ্ন করিলেন, I say, how long are we to wait in this hell of a station ?

নির্বিকারচিত্তে মাখনবাবু বলিলেন, Can't say.

সাহেব একটু রাগতস্বরে উত্তর দিলেন, if I cannot

reach my place to-day, I shall sue the Railway Company.

মাখনবাবু এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। খানিক দূর আগাইয়া গিয়া কেবল নিম্নস্বরে বলিলেন, ব্যাটাচ্ছেলে! এবং আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখা গেল, কয়েকটি যুবক এক জায়গায় জমায়েত হইয়া হাস্য-পরিহাসে বেশ মশগুল হইয়া উঠিয়াছে। যুবকগুলির চেহারা বেশবাস কথাবার্তা বৈচিত্র্যময়। কাহারও পরিধানে ঢিলা পায়জামা, কেহ কাপড়টাকে কায়দা করিয়া পায়জামার মত করিয়া পরিয়াছে, জুলফি গোঁফ ও দাড়িতেও অতি-আধুনিকতার উগ্রতা। এসবের কোন অভাব নাই, অভাব দেখিলাম ভব্যতার। একটি ট্যারা-গোছের ছোকরা কোমরে হাত দিয়া দুলিয়া দুলিয়া হো-হো করিয়া হাসিতেছিল।

ইহাদের এত আনন্দের উৎস কি, তাহাও পরক্ষণেই আবিষ্কার করিলাম। নিকটেই দেখিলাম, একটি কমবয়সী মেয়ে একেবারে একাকিনী একটি স্যুট্‌কেসের উপর বসিয়া আছে। কাছাকাছি তাহার কোন আত্মীয়স্বজন আছে বলিয়া মনে হইল না। মেয়েটি গম্ভীরভাবে দূরে মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশেই, খুব সম্ভবত তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই, যেসব চটুল আলোচনা চলিতেছিল, তাহা যে তাহার কানে যাইতেছে মুখ দেখিয়া তাহা বোঝা গেল না। তথাপি

আমার মনে হইল, মেয়েটির চোখে যেন একটা বিরক্ত বিপন্ন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। একবার মনে হইল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাহার কোন সাহায্য আমি করিতে পারি কি না; কিন্তু সঙ্কোচ হইল, পারিলাম না।

একটু দূরে দুম-দুম করিয়া কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্দুকের শব্দ কেন মাখনবাবু ?

মাখনবাবু বলিলেন, গোটা দুই সাহেব ছিল মশাই ফার্স্ট ক্লাসে। তারা ট্রেন ছাড়বার কোন উপক্রম না দেখে বন্দুক ঘাড়ে ক'রে বেরিয়ে পড়ল। আস্পর্ধা দেখুন না মশাই, যাবার সময় মাস্টার মশাইকে ব'লে গেল যে, তারা না আসা পর্যন্ত যেন ট্রেন ছাড়া না হয়। তারা কাছাকাছিই থাকবে, ট্রেন ঠিক হলে তাদের যেন খবর পাঠানো হয়। নবাবপুত্তুর সব! মাস্টার মশাইকে আমি চোখ টিপছিলুম, যেন তিনি ওসব কথা গ্রাহ্য না করেন। কিন্তু মাস্টার মশাই আমাদের সাহেব দেখলেই একেবারে গলে যান। সেলাম ক'রে হাত কচলে ব'লে দিলেন, ইয়েস সার্—ইয়েস সার্। যত সব—

মাখনবাবুর কোয়ার্টারের সম্মুখীন হইয়াছিলাম। মাখনবাবু বাহির হইতেই চীৎকার করিলেন, কই বিনু, চা রেডি তো? আমার সেই বন্ধুটিকে ধ'রে এনেছি। চা দাও।

বিনু ওরফে বিনোদিনীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মাখনবাবু তখন আমাকে দাঁড়াইতে বলিয়া ভিতরে গেলেন।

মাখনবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, সে কি! চায়ের জল এখনও চড়াওনি?

আমার তো পাঁচটা হাত নয়। বাসন মেজে, ঘর ধুয়ে এই তো সবে কাপড়টি ছেড়েছি। বন্ধু আবার কে?

শুনিয়া একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। মাখনবাবু বাহিরে আসিয়া সহাস্যমুখে আমাকে বলিলেন, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন—আগেকার চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, বিনু সেটা আর দিতে চায় না। ফ্রেশ জল চড়াচ্ছে। আসুন।

গেলাম।

ভিতরে একটি মাত্র ঘর।

সেইটিই বসিবার ও শুইবার ঘর বলিয়া মনে হইল। আরও দুই-একটি ছোটখাটো ঘর আছে। সেগুলি বোধ হয় রান্না-ভাঁড়ারের কাজে নিয়োজিত। সঙ্কীর্ণ উঠানে একটা ধূমায়িত কয়লার উনানের সামনে বসিয়া বিনু প্রাণপণে হাওয়া করিয়া চলিয়াছেন। পরনে একখানি আধময়লা শাড়ি। হাতে কয়েকগাছি সবুজ রঙের কাচের চুড়ি ঝুনঝুন করিয়া বাজিতেছে।

চতুর্দিক ধূমাচ্ছন্ন।

মাখনবাবুর জবরদস্ত আতিথেয়তা যে এই বধূটিকে বিব্রত করিতেছে, তাহা মনে মনে বুঝিতেছিলাম। কিন্তু কি করিয়া ভদ্রভাবে উদ্ধার পাই, কিছুতেই মাথায় আসিতেছিল না।

মাখনবাবু খুব আন্তরিকতার সহিত বলিলেন, আসুন, আসুন। যা আমাদের ঘর-দোর! পায়রার খোপ বললেও

চলে। এঃ, বড্ড ধোঁয়া হ'ল যে!—বলিয়া তিনি কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। কপাটটা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে আমার যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। আমি বলিলাম, কপাটটা খুলে দিন।

আরও ধোঁয়া ঢুকবে যে মশাই, এ ধোঁয়া এখুনি বেরিয়ে যাবে। দাঁড়ান না, জানলাটা খুলে দিই বেশ ক'রে। ঘরটার এই একটা সুবিধে আছে, দক্ষিণ দিকটা বেশ খোলা।—বলিয়া তিনি জানালাটা খুলিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন, একটু কি অসুবিধে জানেন—জানলাটা খুলে দিলে একটু বে-আবরু হয়ে পড়ে। দাঁড়ান, দেখি, চায়ের জলটা কদ্দূর!—বলিয়া তিনি আবার কপাটটা খুলিয়া বাহিরে গেলেন। এই ধূমাচ্ছন্ন ঘরটা হইতে মুক্তি পাইলে যেন বাঁচি। অথচ মাখনবাবুর মনে কষ্ট দিতেও সঙ্কোচ হইতেছে। মাখনবাবু বাহিরে তাঁহার স্ত্রীকে নিম্নস্বরে কি সব বলিতেছেন, শুনিতে পাইলাম না। মাখনবাবু ঘরে ঢুকিতেই একটা বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল।

ওয়েটিং-রুমে সেই বিধবাটিকে জল দিয়ে আসতে হবে—ভুলে গেলেন বুঝি? বাঃ! দিন একটু জল, দিয়ে আসি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তো। তা আপনি যাবেন কেন? আপনি বসুন না। আমি গিয়ে দিয়ে আসছি।

না না, আমিই দিয়ে আসি। জুতো পায়ে দিয়ে গেলে হবে না আবার।

মাখনবাবু হাসিয়া বলিলেন, কেন, আমি খালি পায়ে যেতে

পারি না নাকি? চেরটা কাল খালি পায়েই কেটেছে মশাই, ম্যাট্রিক ক্লাসে ওঠবার পর তবে জুতো পায়ে দিয়েছি।

আমি বলিলাম, না, শুধু জুতোর কথা নয়, আপনার হাতে যদি আবার না খান! আপনি তো ব্রাহ্মণ নন। বিধবাটি একটু বেশি নিষ্ঠাবতী ব'লে মনে হ'ল।

মাখনবাবু পরাস্ত হইয়া বলিলেন, তা হ'লে তো নাচার মশাই। আচ্ছা, আপনিই যান তা হ'লে—চট ক'রে যান, বেশি দেরি করবেন না যেন সেখানে। চা হয়ে গেল ব'লে। বিন্নু, হাউ ফার?—বলিয়া মাখনবাবু বাহিরে গেলেন এবং বলিলেন, আগে এক ঘটি জল দাও তো। ঘটিটা মাজা আছে তো?

বিন্নু উত্তর দিলেন, ঘটি আবার মাজলাম কখন?

কখন মেজেছ, তা জিজ্ঞেস করি নি। মাজা আছে কি না?

কাল মেজেছিলাম সকালে।

আচ্ছা, ওতেই হবে। এক ঘটি জল দাও। ঘরে খাবার-টাবার কিছু আছে? স্রেফ ছোলা গুড়? বেশি নেই? আরে, যা আছে তাই দাও না—তুমি বেশি কথা বাড়িও না।

এক ঘটি জল ও একটি পাথর-বাটিতে কিছু ছোলা-ভিজানো ও গুড় লইয়া নগ্নপদে ওয়েটিং-রুম অভিমুখে রওনা হইয়া গেলাম। কোথাকার কে অচেনা বিধবা, তাহার জন্য জল বহিয়া লইয়া যাইতেছি! পারিপার্শ্বিক ঘটনার এমন সমাবেশ হইয়াছে

যে, কিছুই অসঙ্গত মনে হইতেছে না। বরং না করিলেই যেন অশোভন হইত।

স্টেশন-প্ল্যাট্‌ফর্মে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই কমবয়সী মেয়েটি স্যুট্‌কেসের উপর তেমনই ভাবে বসিয়া আছে এবং তাহার নিকটে নানা ছাঁদের সেই যুবকগুচ্ছ তেমনই হাসাহাসি করিতেছে।

৩

নিষ্ঠাবতী বিধবাকে তৃষ্ণার জল দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করা আমার ভাগ্যে ছিল না। গিয়া দেখিলাম, তিনি একাদশীর পারণ শেষ করিয়াছেন। ভৃত্য ছট্টু খবরটি দিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক দেখিলাম ওয়েটিং-রুমের এক কোণে বসিয়া আহ্নিক করিতেছেন। ভদ্রলোকের ধপধপে সাদা গায়ের রঙ। নগ্ন-গাত্রে শুভ্র উপবীত শোভা পাইতেছে। দৃশ্যটা বেশ ভাল লাগিল। বিধবাটিকে উদ্দেশ করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কহিলাম, এগুলো তা হ'লে ফিরে রেখে আসি?

ভদ্রমহিলা কোন উত্তর না দিয়া মাথার ঘোমটাটা একটু টানিয়া সরিয়া বসিলেন। আমার সহিত বাক্যালাপ করিতে অনিচ্ছুক বুঝিলাম। ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ভৃত্য ছট্টু আসিয়া বলিল যে, বাবুর পূজা এখনই হইয়া যাইবে, মাইজী আপনাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন।

অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

মানুষ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

বসিয়া বসিয়া বিধবাটিকেই লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। অল্প বয়স। কুড়ির বেশি বলিয়া মনে হয় না। ইহারই মধ্যে জীবনের আনন্দ-দীপটি নিবিয়া গিয়াছে। থান-কাপড়, আভরণহীন অঙ্গ, মুখখানি বিষাদ-মাখানো। আজিও আমাদের সমাজে অসহায়া বিধবার সংখ্যা অগণিত। দ্বিতীয়বার বিবাহ করাটা আজও আমাদের হিন্দু বিধবাদের সংস্কারে বাধে। এখনও তাঁহারা ইহাকে পাপ বলিয়াই মনে করেন। আমার নিজেরও বিধবা বোন আছে—বালবিধবা। বাবা আবার তাহার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন। সে কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজি হয় নাই। কৃচ্ছ সাধন করিয়া সে এই জীবনটাকে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিতে চায়।

ও, এই যে আপনি এসেছেন দেখছি! বসুন, বসুন।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। ভদ্রলোক চশমা পরিধান করিতে করিতে বলিলেন, এসব কি এনেছেন আপনি?

মাখনবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাদের জন্যে।

মাখনবাবুটি বুঝি সেই ভদ্রলোক, যিনি তখন আপনাকে ডেকে নিয়ে গেলেন? আরে বাঃ, ছোলা-গুড় এনেছেন দেখছি—দুষ্প্রাপ্য জিনিস আজকাল। মিণ্টু, খাবি?

মিণ্টু মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আচ্ছা আমিই চারটি খাই তা হ'লে।

ছোলা চিবাইতে চিবাইতে ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন, বুড়ো হয়েছি, কিন্তু ছোলা এখনও বেশ চিবুতে পারি। সিক্রেট কি জানেন? নিমের দাঁতন।—বলিয়া সহাস্যমুখে চিবাইতে লাগিলেন।

ট্রেনটা কখন ছাড়বে বলতে পারেন মশাই?

শুনছি তো সন্ধ্যের আগে নয়।

তাই নাকি? আপনি কোথা যাবেন?

কলকাতা।

তা হ'লে তো আপনার আরও ঢের দেরি। আমাদের গাড়ি না ছাড়লে তো আপনার গাড়ি আসবে না। কি মুশকিল!

একটু থামিয়া ভদ্রলোক আবার বলিলেন, এইটুকু শুধু ভগবানের দয়া যে, কারও কোন আঘাত লাগে নি।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোকের স্নিগ্ধ গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া কেমন যেন সম্ভ্রম হইতে লাগিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, বড় খুশি হলাম আপনাকে দেখে। কলকাতায় কি করেন আপনি?

পড়ি।

পড়েন? কোন্ কলেজে?

মেডিকেল—

আরে বাঃ। কোন্ ইয়ার হ'ল?

সিক্স্থ ইয়ার চলছে।

আরে বাঃ! তা হ'লে তো ডাক্তার হয়েই গেছ তুমি—আই মীন আপনি।

সসঙ্কোচে বলিলাম, আমাকে 'তুমি'ই বলুন।

ভদ্রলোক হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ। উঠি উঠি করিতেছি, এমন সময় তিনি বলিলেন, বিনোদ ব'লে কাউকে চিনতে—বিনোদবিহারী মৈত্র? তোমার চেয়ে কিছু সিনিয়র—বছর চারেকের।

বলিলাম, না, চিনি না। কেন?

ভদ্রলোক একটু থামিয়া বলিলেন, সে আমার ছেলে।

কোথায় প্র্যাক্‌টিস করছেন? চাকরি পেয়েছেন নাকি?

পাগল হয়ে গেছে সে। এখন পাগলা-গারদে আছে।

নিদারুণ সংবাদটা যেন বুলেটের মত আসিয়া বিঁধিল। ভদ্রলোকও কিছু বলিলেন না। আমিও বলিবার কথা কিছু খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। মনে হইল, বিধবা যুবতীটি একদৃষ্টে যেন আমার দিকে চাহিয়া আছেন। ফিরিয়া দেখিলাম, সত্যই তাই। আমাকে মনোযোগী দেখিয়া তিনি আবার সসঙ্কোচে মাথায় কাপড়টা টানিয়া সরিয়া বসিলেন।

উঠিয়া পড়িলাম।

চললাম এখন। মাখনবাবু চা খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন। দেরি হয়ে যাবে।

ভদ্রলোক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই বলিলেন, মাখনবাবু কে?

যে ভদ্রলোক আপনাদের এই ছোলা-গুড় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে বাঃ, ভুলেই গেছলাম। তাঁকে আমার ধন্যবাদ দিও।

ভদ্রলোকের মনের মেঘটা যেন কাটিয়া গেল। আমি নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম। ভদ্রলোক বলিলেন, তুমি বাবা, চা-টা খেয়ে এস আবার। এখানে কতক্ষণ থাকতে হবে বলা তো যায় না। একটু গল্প-সল্প করা যাবে।

আচ্ছা।

প্ল্যাট্‌ফর্মের উপর দিয়া অন্যমনস্ক হইয়া চলিয়াছিলাম।

বাবুজী! এ বাবুজী!

ফিরিয়া দেখিলাম, ডাকিতেছে সেই বেণী-দোলানো মুসলমানের মেয়েটি। আমি ফিরিতেই মুখটি ছুঁচলো করিয়া টুকটুকে লাল জিভটি বাহির করিয়াই ছুট দিল।

দুষ্টু মেয়ে!

একটু দূরে গিয়াই সেই বেঁটে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা।

নমস্কার দারোগাবাবু।

কি আশ্চর্য, ভদ্রলোক সত্যই যে আমাকে দারোগা ঠাওরাইয়াছেন! ভদ্রলোকের ভুলটা ভাঙাইতে ইচ্ছা করিল না। স্মিতমুখে প্রতি-নমস্কার করিলাম।

তিনি বলিলেন, ওই হালুয়াই ব্যাটাকে একটু শাসিয়ে দিতে পারেন আপনি? লুচির সের এক টাকায় চড়িয়ে দিয়েছে! এ কি মগের মুলুক নাকি মশায়? আমরা না হয় নিরুপায় হয়ে পড়েছি, তাই ব'লে গলায় ছুরি দেবে ও?

কোন্ হালুয়াই?

ওই যে ইষ্টিশানের ওপারে আছে এক ব্যাটা। কোন কালে এক পয়সার বিক্রি হ'ত না, আজ ব্যাটার মরস্থম প'ড়ে গেছে।

আমার শাসন কি শুনবে ও?

নিশ্চয় শুনবে। পুলিসের গুঁতোয় বড় বড় চোর শায়েস্তা হয়ে যায়, ও ব্যাটা তো সামান্য হালুয়াই।

আগাইয়া গেলাম।

সেই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক—যিনি কলের কাছে চীৎকার জুড়িয়াছিলেন—দেখিলাম, স্নান সমাপন করিয়াছেন। একটি লাল গামছা পরিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। ভদ্রলোকের বাহুমূলে প্রকাণ্ড মাহুলি ও রুদ্রাক্ষ, গলদেশেও তাবিজ-জাতীয় কি একটা ছুলিতেছে। তিনি নগ্নগাত্রে গামছা পরিয়া বোধ হয় সূর্যস্তব পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার কাছে একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের বালক আবদার জুড়িয়া নাকে কাঁদিতেছে।

খিদে পেয়েছে দাছু, ওরা সবাই লুচি জিলিপি খাচ্ছে, আমিও খাব—হুঁ হুঁ দাছু—

ভদ্রলোক মন্ত্র ভুলিয়া খ্যাঁকাইয়া উঠিলেন।

আরে, জ্বালিয়ে খেলে তো দেখছি এটা! তোকে লুচি জিলিপি খাওয়াব ব'লে কি পয়সা সঙ্গে ক'রে এনেছি নাকি? মাত্র ট্রেন ভাড়াটি নিয়ে তো বেরিয়েছিলাম, তখন কি জানি, এমন হবে? চুপ কর্।—বলিয়া আবার তিনি মন্ত্রে মন দিলেন।

হিং—হিং লিজিয়ে বাবু—আচ্ছা হিং—

কাবুলিওয়ালাটি তাহার জোব্বাজাব্বা পরিধান করিয়া ব্যবসায় শুরু করিয়া দিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সেলাম করিয়া কাছে আসিল।

হাসিমুখে বলিল, হিং—হিং—বালা হিং। চাক্কু—বালা চাক্কু—আস্‌লি জার্মনি—বড়িয়া চাক্কু—লিজিয়ে বাবুসাব—

আমার প্রয়োজন ছিল না। অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আগাইয়া গেলাম।

এক স্থানে একটা গামছাওয়ালাকে ঘিরিয়া দেখিলাম অনেক যাত্রী গামছাই খরিদ করিতেছে। একজন দুগ্ধবিক্রেতা হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া গরম দুধ ফেরি করিয়া বেড়াইতেছে। সেই মাড়োয়ারীটি মনে হইল এইমাত্র দুগ্ধপান শেষ করিয়াছেন, কারণ তাঁহার হাতে গেলাস এবং গোঁফে দুধ। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক গোঁফে-লাগা দুধটুকুও অপচয় করিতে চান না। ঠোঁট

ও জিভকে নানা প্রকারে বাঁকাইয়া গোঁফটিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিলাম।

স্যুট্‌কেসের উপর যে মেয়েটি বসিয়াছিল এবং যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এক দল ছোকরা ঘুরঘুর করিতেছিল, সেই মেয়েটি দেখিলাম উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কুলির মাথায় স্যুট্‌কেস চাপাইয়া দিয়াছে। আমাকে দেখিয়া বলিল, দয়া ক'রে আপনি ব'লে দিতে পারেন, মেয়েদের বসবার আলাদা জায়গা এখানে আছে কি না ?

অযাচিতভাবে একটি ছোকরা বলিল, আপনার তো আর সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট নেই। এখানে তা ছাড়া যে ফিমেল ওয়েটিং-রুম আছে, তাতে তিল-ধারণের স্থান নেই। বেশ তো ব'সে আছেন আপনি, থাকুন না।

বুঝিলাম, মেয়েটি একটু বিপন্ন হইয়াছে। বলিলাম, আচ্ছা, আসুন আমার সঙ্গে। 'আসুন' বলিয়া আহ্বান তো করিলাম, কিন্তু কোথায় লইয়া গিয়া তাহাকে যে স্থান দিব, তাহা জানি না। মাখনবাবুই ভরসা। দেখি, কতদূর কি করিতে পারি! ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, দুই-তিনটি ছোকরা আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। তাহাদের দৃষ্টির অর্থ সুপরিষ্কার— কোথা হইতে এ লোকটা আসিয়া জুটিল !

মাখনবাবুর বাড়িতে আসিয়া দেখি, মাখনবাবু নাই। তাঁহার স্ত্রী একটি ময়লা গামছায় করিয়া চা ছাঁকিতেছেন।

আমাকে দেখিয়া ভদ্রমহিলা শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাথার ঘোমটাটা টানিয়া দিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, মাখনবাবু কোথায় গেলেন? প্রথমে কোন উত্তরই তিনি দিলেন না। তখন আমি বলিলাম, এই মেয়েটিকে একটু বসান তো আপনার কাছে। দেখি আমি, মাখনবাবু কোথায় গেলেন।

কুলিটা এবং তাহার পিছু পিছু মেয়েটিও আসিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। কুলি স্যুটকেসটা নামাইয়া রাখিল, এবং মেয়েটি আগাইয়া বিনুর কাছে গেল দেখিয়া আমি বলিলাম, আপনি একটু বসুন এখানে। আমি দেখি, মাখনবাবু কোথা গেলেন।

এইবার ফিসফিস করিয়া বিনু সেই মেয়েটিকে বলিলেন, উনি গেছেন দোকানে খাবার আনতে।

আচ্ছা, দেখি আমি।

৪

হালুয়াইয়ের দোকানে সত্যই ভীষণ ভিড়।

প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে রামায়ণ পাঠ করিতে করিতে সে যে-রাবণকে অকুণ্ঠিতচিত্তে গালি দিত, আজ যদি কোন মন্ত্রবলে একদিনের জন্যও সে সেই রাবণ হইতে পারিত, অন্ততঃ সেই রাবণের দশটা মুণ্ড ও বিশটা হাত আয়ত্ত করিতে পারিত, তাহা

হইলে বেচারী বাঁচিয়া যাইত। দুই হাতে সে কত লুচিই ভাজিবে এবং একটা মুখে কত লোকের সহিতই বা কথা কহিবে! অথচ দুই মাইলের মধ্যে তাহার এই একখানি দোকান এবং অকস্মাৎ এতগুলি বুভুক্ষিত লোকের জন্য তাহা প্রস্তুত ছিল না।

ওটা তোমার ছানচা, না, ছোরা হে? এক টাকা সের লুচির দাম! বল কি তুমি? ওরে, চ চ, আর লুচি খেতে হবে না তোকে।

হুঁ হুঁ, দাদু—

সেই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক ও তাহার নাতি আসিয়া জুটিয়াছেন। নাতির হাত ধরিয়া তিনি হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন।

এই, আমাকে এক-পো লুচি আর একটু তরকারি দাও তো?

এই, শুনতা হ্যায়, এক সের পুরি, আউর আধা সের জিলেবি, গরম গরম ভাজকে দেও।

পানতোয়া আছে—পানতোয়া?

এই, এই, আরে ম'লো, ব্যাটা কথাই কয় না যে! ওহে, শুনছ, দু সের লুচি আর আলুর দম—বাসী নাকি ওটা?

এই প্রকার নানা কণ্ঠের নানা চীৎকারকে অগ্রাহ্য করিয়া বনশি হালুয়াই দ্রুতবেগে লুচি ভাজিয়া চলিয়াছে। অন্য কোন দিকে মন দিবার মত বাড়তি ফুরসুৎ তাহার এখন নাই। দুই বৎসর পূর্বে প্রদত্ত এক সন্ন্যাসীর তাবিজের ফল বুঝি ফলিতেছে।

দৈবানুগৃহীত এই দুর্ঘটনা। ইহার অন্তরালে যে মঙ্গল এবং শনির পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান, তাহা আর কেহ না বুঝুক, বন্‌শি হালুয়াই বুঝিতেছিল।

বন্‌শি ভাজিতেছে এবং তাহার ভাই ধাড়ি বিক্রয় করিতেছে। চাকর বুলাকি লুচি বেলিতেছে এবং দরকারমত পাশের কড়াতে-চড়ানো তরকারিটাতে খুন্তি চালাইতেছে। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মাখনবাবুর পাত্তা নাই। সেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দেখিলাম একটু দূরে এক স্থানে দাঁড়াইয়া এই জনতা লক্ষ্য করিতেছেন। গোঁফ পরিষ্কার, দুধের চিহ্নটুকুও আর সেখানে নাই। আমাকে দেখিয়া তিনি অকারণে আবার সেলাম করিলেন। আমিও প্রতি-নমস্কার করিয়া ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। মাখনবাবুকে খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত দেখিতেছি। ভদ্রলোক গেলেন কোথায় ?

অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া বন্‌শি হালুয়াইয়ের সান্নিধ্যলাভ করিলাম।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাখনবাবু কোথায় জান ? বন্‌শি উত্তর দিল না। সে তখন একসঙ্গে দশখানা লুচি কড়াতে ছাড়িয়াছে এবং ছান্‌চা সঞ্চালন করিয়া চেষ্টা করিতেছে ঘি বেশি না পোড়ে। বন্‌শি লোকটি বেঁটে, রঙ কালো, দুই-চারি-গাছা গোঁফ আছে কি না-আছে, মাথার সামনের দিকে চুল নাই বলিলেই চলে। চক্ষু দুইটি হইতে একটা চাপা চতুরতা উঁকি মারিতেছে। পেটটি প্রকাণ্ড। দেহের মধ্যে ওই অবয়বটিই

সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফতুয়া সেটিকে আবৃত করিতে পারে নাই, বস্ত্র লাঞ্ছিত হইয়া সরিয়া গিয়াছে। নাভির বহু নিম্নে নীবিবন্ধন। সমস্ত উদরদেশ উন্মুক্ত আলোকে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত। বন্‌শির সে জন্য লেশমাত্র সঙ্কোচ নাই। সে পার্শ্ববর্তী বুলাকিকে মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে কি যেন বলিতেছে এবং একাগ্রমনে লুচি ভাজিয়া চলিয়াছে। অন্য দিকে খেয়াল দিবার মত অবসর তাহার নাই।

আমি আর একবার চেষ্টা করিলাম।—মাখনবাবু কোথায় জান?

এবার বেশ একটু চীৎকার করিয়াই বলিলাম। সম্ভবত আমার উচ্চ কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়াই বন্‌শি বলিল, মাখনবাবু? ভিতোরে আসেন। 'আসেন' মানে অবশ্য 'আছেন'—ঢুকিয়া পড়িলাম ভিতরে। কোথা মাখনবাবু?

বন্‌শি অঙ্গুলিসঙ্কেতে একটি ক্ষুদ্র দ্বারের দিকে দেখাইয়া দিল। মাখনবাবু কি বন্‌শির অন্তঃপুরে ঢুকিয়াছেন নাকি? গেলাম আমিও। গিয়া দেখি, মাখনবাবু উবু হইয়া বসিয়া একটি কুলিজাতীয় লোকের দ্বারায় কি যেন করাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, ওয়েল্‌কাম ওয়েল্‌-কাম সার্, নিমকি করাচ্ছি। তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, অন্য দিন হ'লে বন্‌শি নিজেই ক'রে দিত। আজ ব্যাটার ফুরসৎ নেই। আমাকে হাতজোড় ক'রে বললে, হুজুর, রামদীনকে দিয়ে বানিয়ে নেন, আমি ভেজে দিচ্ছি। নিমকি জিনিসটা আবার

ব্যাগার-সারা ক'রে করলে হয় না কিনা ; ডল্, ডল্, আর একটু ডল্। বেলতে আর কতক্ষণ যাবে ? ময়দা মাখাটাই আসল।

রামদীন সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গাড়িয়া চক্ষু বুজিয়া ময়দার তালটার উপর ঘুষি চালাইতে শুরু করিল। আমার ভয় হইতে লাগিল, থালাটা না ভাঙিয়া যায়! মাখনবাবুরও দেখিলাম সে ভয় হইয়াছে। কারণ তিনিও বলিলেন, আস্তে, আস্তে।

হঠাৎ বাহিরের কলরবটা যেন বাড়িয়া উঠিল, মারো, ভাগা দেও শালেকো—

বন্‌শির কণ্ঠস্বর শুনিলাম।

ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বাহিরে আসিলাম। আসিয়াও কিন্তু সহসা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ভিড়ের মধ্যে একটা আবর্ত সৃষ্টি হইয়াছে, এইটুকু মাত্র বুঝা গেল।

বন্‌শিকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বাংলা ভাষায় বলিল, ও কুস্থু নেই আসে বাবু, এক শালা লৌণ্ডা জিলেবি চোরাথা থা।

এমন সময় ভিড়ের ভিতর হইতে একটা আর্ত শিশুকণ্ঠ কাঁদিয়া উঠিল, কে যেন তাহাকে মারিতেছে! বাহির হইয়া আসিলাম। ছোট ছেলেকে কেহ মারিতেছে নাকি ? ভিড়ের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। অনেক ঠেলাঠেলি গুঁতাগুঁতির পর ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া দেখিলাম, ছোট ছেলেই বটে। কে যেন তাহার গালে একটা চড় মারিয়াছে, বেশ জোরেই মারিয়াছে, পাঁচটা আঙুলের দাগ বসিয়া গিয়াছে। ছেলেটি সেই শীর্ণকান্তি

ভদ্রলোকের নাতি। সত্যই সে জিলাপি চুরি করিয়াছিল। শীর্ণকান্তি ভদ্রলোককে আশেপাশে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। এক ঠোঙা জিলাপি কিনিয়া ছেলেটির হাতে দিলাম এবং তাহাকে ভিড় হইতে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিলাম।

তোমার দাদু কোথা?

জিলাপিতে কামড় দিতে দিতে সে বলিল, টেশনে।

একটু হিতোপদেশ দিবার ইচ্ছা হইল।

বলিলাম, ছি ছি, তুমি চুরি করেছিলে! ছি!

আমার খিদে লেগেছে যে! দাদুকে বললাম কত, দাদু দিলে না কিনে।

ইহার উপর আর কোন কথা চলে না।

এখন ছেলেটাকে তাহার দাদুর জিম্মা করিয়া দিতে পারিলে বাঁচি। এই ভিড়ে ছাড়িয়া দিলে হারাইয়া যাইতে পারে।

তাহাকে প্লাট্‌ফর্মের দিকেই লইয়া চলিলাম। একটু দূর গিয়াই সেই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোকের দেখা মিলিল। তিনিও নাতির খোঁজে আসিতেছিলেন। সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে বলিলাম।

শুনিয়া তিনি একেবারে রুখিয়া উঠিলেন। হতভাগা, পাজী ছোঁড়া! শাল্‌টীর চৌধুরী-বংশের ছেলে তুমি, তুমি গিয়েছ জিলিপি চুরি করতে! এত বড় নোলা তোমার! মেরেই ফেলব আজ, খুন ক'রে ফেলব আজ হারামজাদাকে।

আমি ছেলেটাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলাম। শাস্তি

ওর যথেষ্ট হয়ে গেছে মশাই, আর কিছু বলবেন না। ছেলেমানুষ—

কিন্তু শাল্টীর চৌধুরী-বংশের মহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। শীর্ণ-কান্তি ভদ্রলোক কোন কথাই শুনিতে চাহেন না। বলব না! বলেন কি আপনি! কেটে পুঁতে ফেলব ওকে আমি। ঝাড়ু মারি আমি অমন বংশধরের মুখে। নচ্ছার, কুলাঙ্গার—

উচ্চৈঃস্বরে এতগুলি সংস্কৃত শব্দ একসঙ্গে উচ্চারিত হইতে লোক জমিয়া গেল।

কি হয়েছে মশাই!

ব্যাপার কি?

চুরি গেল নাকি কিছু?

দুইজন বেহারী নিম্নস্বরে বলাবলি করিতে লাগিল, বাবু বাউরা মালুম হোতা হ্যায়।

কোথা গেলেন সার্?—মাখনবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবার পূর্বে শীর্ণকান্তি ভদ্রলোককে অনুরোধ করিয়া আসিলাম, তিনি যেন আর মারধর না করেন। তথাপি তিনি ছাড়িলেন না, তাড়া করিলেন। নাতি জিলাপির ঠোঙা ফেলিয়া দৌড় দিল। ঠোঙা মাটিতে পড়িতে না পড়িতেই একদল কুকুর হুমড়ি খাইয়া আসিয়া তাহার উপর পড়িল। ছেলেটি সেই যা একটি খাইয়াছিল, বাকিগুলি কুকুরের পেটে গেল।

গরম গরম নিমকি লইয়া মাখনবাবু ও আমি বাসায় ফিরিতেছিলাম। পিছনে পিছনে আসিতেছিল রামদীন। মাখনবাবু আমার দিকে চাহিয়া বাম চক্ষুটা ঈষৎ কুঁচকাইয়া বলিলেন, দেখেছেন তো মহাপ্রভুকে? এঁরই কীর্তি।

বুঝিলাম, রামদীনেরই কথাই বলিতেছেন।

একে বাঁচাবেন বলছিলেন না? কি উপায়ে?

আমার কথা শেষ করিতে না দিয়া বাম হাতের তর্জনী ঠোঁটের উপর চাপিয়া মাখনবাবু তর্জন করিয়া উঠিলেন, আস্তে মশাই, উচ্চারণ করবেন না ও-কথা, জানাজানি হয়ে গেলেই সর্বনাশ।

তাহার পর এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, বেশ ক'রে চা-টা খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে একটা পরামর্শ করতে হবে। মাস্টার মশাইকে ডেকে আনা যাবে। আপনার মত পাকা মাথা একটা পাওয়া গেছে, ব্যাটার কপাল ভাল।

আমি এ বিষয়ে আর কি পরামর্শ দেব আপনাদের?

বাঃ, আপনি বয়সে ছোট হ'লেও শিক্ষিত লোক, আপনার বুদ্ধির দামই আলাদা। আমার নিজের বিদ্যে ম্যাট্রিক অবধি। আর মাস্টার মশাইয়ের পেটেও—প্রাইভেট্‌লি বলছি, এক পিলে ছাড়া আর কিছু নেই; কোন রকমে 'ইয়েস সার্', 'নো সার্', 'ভেরি গুড সার্'—! আপনি এসে গেছেন, এ ব্যাটার পরম সৌভাগ্য।

মিনিট-খানেক নীরব থাকিয়া বলিলাম, আপনার বাসায় আর একজন অতিথি এনে জুটিয়েছি। আপনার স্ত্রীর কাছে তাঁকে বসিয়ে এসেছি।

মাখনবাবু চলিতে চলিতে থামিয়া পড়িলেন।

হোয়াট? আবার কে অতিথি মশাই? আগে বললে নিমকি কিছু বেশি নিতাম যে!

ওতেই যথেষ্ট হবে, চলুন।

চলিতে চলিতে মাখনবাবু বলিলেন, লোকটি কে?

একটি স্ত্রীলোক।

আবার মাখনবাবু দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

স্ত্রীলোক! ডোবালেন দেখছি। কে? সেই ওয়েটিং-রুমের বিধবা নাকি? আচ্ছা লোক আপনি! ওর জন্যে আপনার অত মাথাব্যাথা কেন? ছোলা-টোলা তো সব দিয়ে এলেন।

না না, এ সে নয়, আর একজন।

আর একজন? উঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না! আচ্ছা লোক তো আপনি! ওসব টেন্‌ডেন্সি ছাড়ুন মশাই এই ভিড়ের মধ্যে। কি মুশকিল!—বলিয়া সস্মিতমুখে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। একটু থামিয়া আবার বলিলেন, কে ইনি? আগে চিনতেন নাকি?

না।

সাংঘাতিক লোক আপনি মশাই।

মাখনবাবুর বাসার সমীপবর্তী হইয়াছিলাম। দেখিলাম, জানালায় বিন্নু দাঁড়াইয়া ছিলেন, আমাদের দেখিয়া সরিয়া গেলেন।

শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, মাখনবাবু রামদীনকে বলিতেছেন, ওরে, তুই মাস্টার মশাইয়ের বাড়ি থেকে একখানা চেয়ার বোঁ ক'রে নিয়ে আয় তো। বাইরেই বসা যাক। আমার চেয়ারটাও বার করি। ভেতরে একে জায়গা কম, তার ওপর আপনি—। বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। আমিও তাড়াতাড়ি বলিলাম, হ্যাঁ, সেই ভাল, বাইরেই বেশ হবে।

রামদীন ঊর্ধ্বশ্বাসে একখানা চেয়ার লইয়া আসিল। মাখনবাবুও একখানা ছোট চেয়ার এবং তাহার পর একটা ছোট টেবিলও বাহির করিয়া আনিলেন। টেবিলটা নামাইয়া দিয়া মাখনবাবু এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন, যেন কি খুঁজিতেছেন।

কি খুঁজছেন? পয়সা-টয়সা প'ড়ে গেল নাকি?

না, পয়সা নয়। খুঁজছি একটা সাইজ মাফিক ইঁট।

ইঁট?

হ্যাঁ, টেবিলটা একটু ইয়ে কিনা, মানে পায়া চারটে সমান নয়। একটা পায়ার তলায় একটা ছোট্ট ইঁট না দিলে—এই যে পেয়েছি।

টেবিলটাকে ঠিকমত বসাইয়া মাখনবাবু বলিলেন, এইবার অল রাইট। দেখি, চায়ের কতদূর কি হ'ল!—বলিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

গরুড়-পক্ষীটির মত হাতজোড় করিয়া রামদীন নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আঁটসাঁট গড়নের লোকটি। পরনে রেলের জামা ও পাগড়ি। মুখের দিকে চাহিলেই প্রথমে চোখে পড়ে লাল চক্ষু দুইটি এবং কপালের ও রগের স্ফীত শিরাসমূহ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম রামদীন?

হাঁ, হুজুর। যেন হাঁড়ির ভিতর হইতে শব্দ হইল। এমন সময় মাখনবাবু ফিরিয়া আসিলেন। হাসিয়া হাত দুইটি উলটাইয়া বলিলেন, এগেন কোল্ড সার্! ফের জল চড়িয়েছে, ফাইভ্ মিনিট্‌স মোর। ততক্ষণ আমি মাস্টার মশাইকে ডাকি একটু, আপনার সঙ্গে আলাপটা হয়ে যাক। হাঁ, বাই দি বাই, ওই মেয়েটি তো কিচ্ছু খেতে চাইছে না মশাই। বলছে, শুধু ব'সে থাকতে পেলেই ওর যথেষ্ট। স্ট্রেঞ্জ ক্যারেক্টার? সাধারণতঃ লোকে বসতে পেলেই শুতে চায়। এ একেবারে ঠায় ব'সে আছে, নট নড়নচড়ন নট কিছু। বিনু বললে, স্পিকটি নট, মুখ বুজে চুপচাপ ব'সে আছে। আপনি একটু বলে-ক'য়ে দেখুন না, যদি একটু চা খাওয়াতে পারেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম, দরকার কি জোর-জবরদস্তি করবার? খেতে বলেছেন ওই যথেষ্ট। তা ছাড়া আমিও তো ওঁকে চিনি না যে, গিয়ে অনুরোধ করব। আমার সম্পূর্ণ অচেনা। প্ল্যাট্‌ফর্মে কতকগুলো ছোঁড়া ওঁকে বিরক্ত করছিল, তাই আমাকে উনি বললেন, ফিমেল ওয়েটিং-রুমটা

দেখিয়ে দিতে। আমি আপনার বাসাতেই নিয়ে এলাম।

বেশ আছেন আপনি!—বলিয়া হাসিয়া মাখনবাবু মাস্টার মশাইকে ডাকিতে গেলেন।

স্টেশন-মাস্টারের বাসা নিকটেই।

একটু পরেই স্টেশন-মাস্টার মহাশয় আসিলেন। ভদ্রলোকের হাঁপানি আছে, লক্ষ্য করিলাম। তাঁহার গায়েও রেলের জামা। গলায় একটা বেমানান গোছের সবুজ মাফ্‌লার। কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফে মুখমণ্ডল সমাচ্ছন্ন। চোখের তারা দুইটি সর্বদাই যেন কুঞ্চিত ভ্রূযুগলে কিছু দেখিবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ আবার মাঝে মাঝে সম্মুখের দিকে চট করিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। আমার দিকে চকিতে চাহিয়া আবার ঊর্ধ্বনেত্র হইলেন। আমি নমস্কার করাতে একবার ক্ষণিকের জন্য আমার দিকে চাহিয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন।

মাখনবাবু বলিলেন, এঁরই কথা বলছিলাম।

ও।—বলিয়া মাস্টার মহাশয় নিকটস্থ চেয়ারটাতে বসিয়া হাপাইতে লাগিলেন।

রামদীন চা ও নিমকি লইয়া আসিল।

মাস্টার মহাশয় ও আমার সম্মুখে এক পেয়ালা করিয়া চা ও প্রচুর নিমকি আগাইয়া দিয়া মাখনবাবু বলিলেন, খেতে খেতে আলাপটা হোক সার্।

মাস্টার মহাশয় হাত নাড়িয়া অতি কষ্টে বলিলেন,

খাবার-টাবার খাব না, ওসব চলবে না। খেলেই হাঁপানি বাড়ে। চা বরং চলতে পারে একটু। এ সময় আমি খাইও এক কাপ।—বলিয়া তিনি একটা পেয়ালা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া পকেটে কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন। দুইটি পকেটই খুঁজিলেন, কিন্তু ঈপ্সিত বস্তু পাওয়া গেল না। মাখনবাবু হাসিয়া বলিলেন, লেফ্‌ট বিহাইণ্ড বুঝি? ওরে রামদীন!

রামদীন বাড়ির ভিতরে ছিল। দৌড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। রামদীন আসিতেই মাখনবাবু বলিলেন, ওরে, দৌড়ে গিয়ে বাবুর আপিঙের কৌটোটা নিয়ে আয় তো।

রামদীন দৌড়িল।

মাস্টার মশাই ঊর্ধ্বনেত্র হইয়া চক্ষু মিটমিট করিতে করিতে বলিলেন, বালিশের নীচে আছে ব'লে দিন।

মাখনবাবু আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে রামদীন, শোন্, বালিশের নীচে আছে, বুঝলি?

হাঁ, হুজুর।

রামদীন চলিয়া গেল।

রামদীন না আসা পর্যন্ত আমরা সকলেই রামদীনের পথপানে চাহিয়া রহিলাম। আপিঙের কৌটা না আসা পর্যন্ত জমিবে না। যদিও বেশি দেরি হয় নাই, মাখনবাবু তথাপি অধীর হইয়া উঠিলেন, এ ব্যাটা গাঁজাখোরকে নিয়ে আর পারা যায় না! এমন সময় রামদীনকে দেখা গেল, বেচারা দৌড়াইয়া আসিতেছে।

এক গুলি অহিফেন গলাধঃকরণ করিয়া এবং তৎপরে চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া মাস্টার মশাই বলিলেন, ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে, চাকরি বোধ হয় আর থাকে না। আচ্ছা মাখনবাবু, আমি ভাবছি, এ ভদ্রলোককে আমাদের এসব ব্যাপারে জড়ানো কি ঠিক হবে ?

মাখনবাবু নড়বড়ে টেবিলটি চাপড়াইয়া বলিলেন,সারটেন্‌লি —নিশ্চয়ই। আমাদের এখন কারুরই মাথার ঠিক নেই। আপনারও নেই, আমারও নেই। অর্থাৎ কি ভাবে দোষটা অপরের ঘাড়ে চাপানো যায়, সেই পরামর্শটা—

মাস্টায় মহাশয়ের ভ্রূ-সন্ধানী নয়নযুগল ঘন ঘন মিটমিট করিতে লাগিল। তিনি গভীর চিন্তামগ্নভাবে আর এক চুমুক চা পান করিলেন। আমার সহিত এই সব গোপনীয় অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করিতে মাস্টার মহাশয়ের মন সরিতেছিল না।

আমার নিজেরও মনোগত অভিপ্রায় ছিল না এই সব ব্যাপারে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতে। কিন্তু মাখনবাবু নাছোড়। তিনি কনুই দিয়া আমার পিঠে একটা খোঁচা দিয়া বলিলেন, বলুন না মশাই, কার ঘাড়ে দোষটা চাপানো যায় ?— বলিয়াই তিনি ঘাড় ফিরাইয়া একবার চতুর্দিক দেখিয়া লইলেন, অপর কেহ আমাদের কথাবার্তা শুনিতেছে কি না! এক রামদীন ছাড়া কাছে-পিঠে আর কেহ ছিল না।

মাখনবাবু বলিলেন, এই রামদীন, সিগ্রেট লে আও।

রামদীন চলিয়া গেলে আমি বলিলাম, রামদীনকে বাঁচাতে হ'লে হয় ড্রাইভারের দোষ দিতে হয়, না হয় ইঞ্জিনের দোষ দিতে হয়, না হয় রেল-লাইনের দোষ দিতে হয়। এর মধ্যে কোন্‌টা সম্ভবপর হতে পারে, ভেবে দেখুন আপনারা। মাস্টার মহাশয় নিমেষের জন্য আমার পানে চাহিয়া আবার ঊর্ধ্বনেত্র হইলেন। তাঁহার চোখের পাতা খুব ঘন ঘন ওঠা-নামা করিতে লাগিল।

মাখনবাবু আমার চিন্তাপ্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ সাস্মিত দৃষ্টিতে মাস্টার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভাবটা যেন, দেখিলেন তো, কেমন গুছাইয়া জিনিসটাকে বলিলেন ইনি ? মাস্টার মহাশয় ঊর্ধ্ব-দৃষ্টি হইয়া হাঁপাইতেছিলেন, তিনি মাখনবাবুর এই পুলকিত মুখচ্ছবি দেখিতে পাইলেন না। বুঝিলাম, তাঁহার পক্ষে বেশি কথা বলা কষ্টকর।

মাখনবাবুকে আমি আবার বললাম, তা ছাড়া আমার আর একটা কথা মনে হচ্ছে এখন। বলিলাম বটে, ইঞ্জিন আর রেল-লাইনের দোষ দেওয়া যায়, কিন্তু ভেবে দেখছি, ও দুটো বোধ হয় খাটবে না।

কেন ? হোয়াই ?—বিজ্ঞভাবে মাখনবাবু বলিলেন। মাস্টার মহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে মনোযোগসহকারেই আমাদের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। তাঁহার চিন্তাগ্রস্ত মুখে ও দ্রুত নড়নশীল চোখের পাতায় তাহা প্রতীয়মান হইতেছিল।

আমি বলিলাম, ইঞ্জিন আর রেল-লাইন যে ঠিক আছে, তা তো যে কোন ইঞ্জিনিয়ার এসেই ধ'রে ফেলবে। রামদীনকে

বাঁচাতে হ'লে ড্রাইভারের নামে দোষ চাপানো ছাড়া আর কোন বুদ্ধি তো মাথায় আসছে না।

মাখনবাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, তা তো ঠিক। কিন্তু হাউ? কেমন ক'রে?

সেটা ভেবে দেখতে হবে। বলতে পারেন, ড্রাইভার মাতাল অবস্থায় এই কাণ্ড করেছে, কিংবা ওই রকম একটা কিছু—

মাস্টার মহাশয়ের নয়নযুগল অল্পক্ষণের জন্য আমার মুখপানে নিবদ্ধ হইয়া আবার উর্ধ্বগামী হইল। মুখমণ্ডলে ক্ষণিকের জন্য যেন একটা আনন্দের আলো ফুটিয়া উঠিল। তিনি একটু থামিয়া থামিয়া বলিলেন, আমিও রিপোর্ট করেছি তাই। ড্রাইভার ফাউণ্ড ড্রাঙ্ক। এখন কথা হচ্ছে—। বলিয়া তিনি চায়ের বাটিতে আর একটা চুমুক দিলেন।

মাখনবাবু বলিলেন, আপনি রিপোর্ট ক'রে দিয়েছেন, অল্‌রেডি?

হ্যাঁ হ্যাঁ। আরে, এই সামান্য বুদ্ধিটা কি আর আমার ঘটে নেই, অ্যাদ্দিন চাকরি করছি, হ্যাঃ! কি মনে কর তুমি আমাকে?

মাখনবাবু হাসিয়া বলিলেন, গ্রেট মেন থিঙ্ক অ্যালাইক। মাস্টার মহাশয় কিছু না বলিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। এই উত্তেজনাটুকুতে তাঁহার হাঁপানিটা যেন বাড়িয়া গেল। চাটুকু নিঃশেষ করিয়া মাস্টার মশাই উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময়

বলিয়া গেলেন, আপনারা দুজনে ভেবে-চিন্তে দেখুন জিনিসটাকে। 'ড্রাঙ্ক' বললেই তো হবে না। প্রমাণের ওপর সেটাকে দাঁড় করাতে হবে তো?

নিমকিতে একটা কামড় দিয়া মাখনবাবু বলিলেন, সার্টেন্‌লি—নিশ্চয়ই।

রামদীন এক প্যাকেট সিগারেট লইয়া আসিল। একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে আমি বলিলাম, যাই, প্ল্যাট্‌ফর্মটায় একবার ঘুরে-ফিরে আসি।

মাখনবাবু বলিলেন, বেশি দেরি করবেন না যেন। রান্না প্রায় শেষ হয়ে গেল। আপনি আমার এখানে খাবেন, সে কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য। রান্না প্রায় হয়ে এল। আর হ্যাঁ, আপনি ওই মেয়েটিকে ব'লে-ক'য়ে দেখুন না, যদি একটু কিছু খাওয়াতে পারেন।

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, আপনার স্ত্রী সেসব ঠিক করবেন এখন। আমার এ রকম ভাবে বলাটা কি ভাল দেখায়? ভেবে দেখুন না!

মাখনবাবু চায়ের বাটিতে চুমুক দিতেছিলেন। বাটিটা নামাইয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বিনু ওসব বিষয়ে খুব ওস্তাদ আছে। পরকে এমন আপন করতে পারে! গিয়ে হয়তো দেখব, দুজনে হরিহর-আত্মা হয়ে ব'সে আছে। কিছু বলা যায় না। —বলিয়া মাখনবাবু এতদূর হইতে অনর্থক উঁকিঝুঁকি দিয়া অন্তঃপুরের অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, একটু ঘুরে আসি তা হ'লে!

যান, বেশি দেরি করবেন না। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, আর কাউকে জোটাবেন না যেন।

চলিয়া যাইতেছিলাম। মাখনবাবু আবার পিছু ডাকিলেন।

দিস ফেলোর কথাটাও একটু ভাবেবেন। শক্ত সমস্যা। ড্রাঙ্ক বললেই তো হবে না, প্রমাণ করতে হবে।

আমি হাসিয়া বলিলাম, রামদীনকে বলুন না. ড্রাইভারটাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদি সত্যিই একটু মদ খাওয়াতে পারে। বিনা পয়সায় পেলে হয়তো খেতেও পারে—

মাখনবাবুর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, দেখি, মন্দ বুদ্ধি নয় এটা। মাথা বটে আপনার!

৬

প্ল্যাট্ফর্মের ভিতর দিয়া চলিতেছিলাম।

হঠাৎ নজরে পড়িল, সেই বেণী-দোলানো মেয়েটি রেল-লাইনের বেড়া-দেওয়া তারের উপর দাঁড়াইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া ঢুলিতেছে। আমাকে দেখিতে পাইল না। পাইলে তাহার টুকটুকে লাল জিভটুকু বাহির করিয়া মুখভঙ্গীসহকারে ঠিক অভ্যর্থনা করিত। একবার মনে করিলাম, ডাকি মেয়েটিকে।

কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। নিকটেই একটা গোলমাল উঠিল। একদল লোক তালগোল পাকাইয়া একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে। নিকটে গিয়া দেখি, সেই

কাবুলিওয়ালা একটি যুবকের হাত চাপিয়া ধরিয়াছে এবং মার্জার-কবলিত মূষিকের ন্যায় যুবকটি চিঁচিঁ করিতেছে। কৌতূহল হইল। ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে গেলাম। কাবুলী আমাকে দেখিয়া বলিল, উজুর, আপ দেখিয়ে, আপ বালা আদমি, ইন্‌সাফ কর্‌ দিজিয়ে।—বলিয়া সে যাহা বলিল, তাহার মর্মার্থ এই যে, এই যুবকটি কাবুলীটির নিকট ছুরি কিনিবে বলিয়া একটি ছুরি চাহিয়া লয় এবং ছুরির ধার আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নিজের হাতের নখগুলি কাটিতে থাকে। দুইটি হাতের সমস্ত নখ নিপুণভাবে কাটিয়া এখন ছোকরা ছুরিটি এই অজুহাতে ফিরাইয়া দিতে চায় যে, ছুরিটি আশানুরূপ তীক্ষ্ণ নহে। তদুত্তরে কাবুলিওয়ালা বলিতেছে যে, ছুরির ধার আছে কি না, তাহা সে এখনই সর্বসমক্ষে প্রমাণ করিয়া দিবে এই বেইমানের নাসিকা ছেদন করিয়া। যুবকটির দিকে চাহিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলাম। সেই ট্যারা ছোকরা। একাকিনী ভদ্রমহিলাটির সম্মুখে একটু আগেই দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছিল।

তাহাকে বলিলাম, আপনি ছুরি যখন নেবেন না, তখন মিছিমিছি কেন ওর ছুরি দিয়ে নখ কাটলেন?

ধার নেই মশাই ওর ছুরিতে।

ধার নেই তো দশটা আঙুলের নখ অমন সুন্দরভাবে কাটলেন কি ক'রে?

জুট বাত মৎ বোল্‌না।—কাবুলী গর্জন করিয়া উঠিল।

ট্যারা ছোকরাটি বলিল, তা ছাড়া অত দাম দিয়ে ছুরি কে নেবে মশাই, দাম বলছে, আড়াই টাকা!

আচ্ছা, দো রূপেয়ামে দেগা, নাফা ছোড় দিয়া।

আমি বলিলাম, কাজটা ঠিক হয় নি আপনার। এর সঙ্গে যখন দরদস্তুর করেছেন, হাতের নখ কেটেছেন, তখন নেওয়া উচিত আপনার ছুরিটা।

আমার কাছে অত পয়সা এখন নেই তো।

আপনার বন্ধুবান্ধবদের কাছে দেখুন। আপনারা তো এক দল ছিলেন।

আপনি যখন বলছেন, তাই দেখি। এই, হাত ছোড়ো।

কাবুলী হাত ছাড়িয়া দিল।

কাবুলীকে বলিলাম, বেচারার নিকট পয়সা নাই। বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে যোগাড় করিয়া আনিতেছে। কাবুলিওয়ালা ছোকরার পিছু পিছু গেল। আমি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম, ছোকরার বন্ধুবান্ধবদের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সব সরিয়া পড়িয়াছে।

আর একটু আগাইয়া যাইতেই সেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি এবারও আমাকে সেলাম করিলেন। শুধু সেলাম করিয়াই এবার ক্ষান্ত রহিলেন না, নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন যে, আমার সহিত তাঁহার গোপন একটা পরামর্শ আছে, আমি যদি অনুমতি করি। বিস্মিত হইলাম। আমার সহিত কি গোপন পরামর্শ থাকিতে পারে?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, বেশ তো, বলুন। তিনি বলিলেন যে, এখানে অনেক লোকজন রহিয়াছে, পরামর্শটা প্ল্যাট্‌ফর্মের বাহিরে হওয়াটাই সমীচীন। আমি তখন বলিলাম যে, ওয়েটিং-রুমে এক ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিতে যাইতেছি, সেটা না সারিয়া এখন আমি প্ল্যাট্‌ফর্মের বাহিরে যাইব না। তিনি কি অপেক্ষা করিবেন ?

বহুত খুব।

আমি ওয়েটিং-রুমে ঢুকিয়া পড়িলাম। মাড়োয়ারীটি চঞ্চল-ভাবে প্ল্যাট্‌ফর্মে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ওয়েটিং-রুমে ঢুকিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ বিছানা বিছাইয়া বেশ জমিয়া বসিয়া একটি বই পড়িতেছেন। তাঁহার বিধবা কন্যাটি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ঘরের এক কোণে স্টোভে রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন।

এস এস, আরে বাঃ, চা-টা খাওয়া হয়ে গেল ? ব'স, ব'স, এই বিছানাতেই ব'স না তুমি !

ভদ্রলোক মহা উৎসাহে আমাকে আপ্যায়িত করিয়া বসাইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি বই পড়ছেন ওটা ?

ভদ্রলোক বইখানা লুকাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, ও একটা বাজে বই ব'লে মনে হবে তোমার। আমার কিন্তু বেশ লাগে।

বিধবা মেয়েটি দেখিলাম মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। আমি আবার বলিলাম, কি বই ?

আমার এই বয়সে 'পিল্‌গ্রিম্‌স প্রগ্রেস' বা গীতা বা ওই রকম কিছু একটা পড়া উচিত ; কিন্তু খুব ভাল লাগে আমার এই বইখানা।—বলিয়া বইটা আমার হাতে দিলেন।

দেখিলাম, 'অ্যালিস ইন ওয়ান্‌ডার্‌ল্যাণ্ড'। বলা বাহুল্য, আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আরও দুই-তিনখানা বই কাছে পড়িয়া আছে দেখিলাম। বলিলাম, বইটা তো খুব ভাল বই। ছোট ছেলেমেয়েদের এমন বই আর হয় নি।

ম্লান হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, ভেবেছিলাম, নাতি-নাতনীদের নিয়ে বুড়ো বয়সে এই বইগুলো আবার বেশ জমিয়ে পড়ব, কিন্তু ভগবান আমার কপালে সে সুখ তো আর লেখেন নি। তাই একা একাই পড়ি।

চুপ করিয়া রহিলাম।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা খুব গোঁড়া হিন্দু, না ?

তিনি হাসিয়া বলিলেন, না, মোটেই না। তবে আমার মেয়ে কিছুদিন থেকে—। বলিয়া তিনি চকিতে একবার কন্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন।—ও কিছুদিন থেকে ভয়ানক গোঁড়া হয়ে উঠেছে।

আমি বলিলাম, কিছুদিন থেকে মানে ? আগে গোঁড়া ছিলেন না ?

না, মোটেই না। কলেজে-পড়া মেয়ে কি সহজে গোঁড়া হয় ! ও বি. এ. পাস করেছে আজ বছর চারেক হ'ল, তাই না মিণ্টু ?

মিণ্টু কিন্তু দেখিলাম আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া আলু ছাড়াইতেছেন। বৃদ্ধের কথায় একটু মাথা নীচু করিলেন মাত্র।

হ্যাঁ, চার বছরই।—বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিয়া গেলেন।

মিণ্টু নীরবে তরকারি কুটিতে লাগিলেন। আমি 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যাণ্ডে'র পাতাগুলা উল্টাইয়া ছবি দেখিতে লাগিলাম। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, বরাত, বরাত, সবই অদৃষ্ট। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই। বুঝলে বাবা? বিধাতার বিধানকে মেনে নেবার মত মনের শক্তি থাকা দরকার। আমার ওইটের অভাব ছিল ব'লেই এত কষ্ট পেলাম।—বলিয়া বৃদ্ধ একটু হাসিলেন।

একটু চুপ করিয়া আবার শুরু করিলেন, বিধাতার বিধানকে মেনে নেওয়াই উচিত। বিনোদ পাগল হয়ে গেছে, পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি তো। মিণ্টু বিধবা হয়েছিল, সেটাকেও এমনই ভাবে মেনে নিলেই চুকে যেত। কিন্তু আমি গেলাম বিধাতার ওপর টেক্কা দিতে। বিধাতা সে কথা শুনবে কেন? আরে বাঃ!—বলিয়া আবার একটু হাসিলেন।

হঠাৎ মিণ্টু বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আচ্ছা বাবা, নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা বাইরের পাঁচজনকে শুনিয়ে লাভ কি? এসব কি ব'লে বেড়াবার মত কথা?

আমি বলিলাম, থাক্, দরকার কি ওসব কথার? এবার আমাকে উঠতেও হবে।—বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিলাম।

বৃদ্ধ একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। বলিলেন, এরই মধ্যে উঠবে কোথায়? ট্রেনের তো এখন ঢের দেরি। আমাদের এইখানেই যখন রান্না হচ্ছে, তখন এইখানেই চারটি খাও না।

আমার আপত্তি নেই তাতে। কিন্তু মাখনবাবুর বাড়িতে আমার জন্যে রান্না হচ্ছে, শুনলাম।

ও, আচ্ছা, সেইখানেই খেও তা হ'লে। তবু ব'স একটু। এর মধ্যেই রান্না নিশ্চয়ই হয়ে যায় নি।

না, তা বোধ হয় নি। আচ্ছা বসছি একটু।—বলিয়া আবার বসিয়া পড়িলাম।

কিন্তু স্বচ্ছন্দ ভাবটা যেন আর ফিরিয়া পাইলাম না। বৃদ্ধ উচ্ছ্বসিত লইয়া বলিতে লাগিলেন, হ্যাঁ, ব'স ব'স, কোথায় যাবে এখন? মেডিকেল কলেজের ছেলে দেখলেই আমার বিনোদকে মনে পড়ে। এর মধ্যে হয়তো কোন যুক্তি নেই, কিন্তু মেডিকেল কলেজের ছাত্র শুনলেই, তাকে নিজের লোক ব'লে মনে হয়, অর্থাৎ—

কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই ভদ্রলোক থামিয়া গেলেন।

খানিকক্ষণ নীরবেই কাটিল।

আমি কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। কোন ছুতায় উঠিয়া পড়িতে পারিলে বাঁচি। এমনং সময় বৃদ্ধ আবার বলিয়া উঠিলেন, মিণ্টু, তুই রাগ করলি, কিন্তু তুই ভেবে দেখ্ দিকি, এসব কথা চেপে রাখা উচিত কি? শিক্ষিত লোক মাত্রকেই সমাজের গলদের কথাটা বলা উচিত, কারণ হয়তো ওঁরা

এর প্রতিকার করতে পারবেন। আমার মনে হয়,খবরের কাগজে লেখালেখি ক'রে সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া দরকার। সম্ভব হ'লে এসব লোককে পুলিসের হাতে দেওয়া কর্তব্য। শরীরের কোথাও যদি ঘা হয়ে প'চে যায়, সেটাকে লুকিয়ে রাখতে হবে? আরে বাঃ! তাঁহার চশমার পুরু লেন্স দুইটি আলোকপাতে অত্যন্ত চকচক করিতে লাগিল। তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, না না, শোন তুমি। তোমার শোনা উচিত। প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের জানা উচিত, কি রকম পাজী সমাজে আমরা বাস করি। মিণ্টু বিধবা হবার পর আমি তার আবার বিয়ে দিয়েছিলাম, সে এক রকম জোর ক'রে। মিণ্টুকে অনেক কষ্টে রাজি করালাম। মিণ্টু যদি রাজি হ'ল, আত্মীয়-স্বজনেরা ঘোরতর আপত্তি করলেন। আমি দেখলাম,আরে বাঃ, আত্মীয়-স্বজনদের মন রাখতে গেলে নিজের বিবেককেই অগ্রাহ্য করতে হয়। লেখাপড়া শিখেছি তা হ'লে কিসের জন্যে? পাত্রের জন্যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম।

বলিয়া ভদ্রলোক একটু চুপ করিয়াই আবার আরম্ভ করিলেন, একদিন সকালবেলা ব'সে আছি, একটি নিরীহ-গোছের লোক এসে দেখা করলেন। বললেন, আমার বিজ্ঞাপন তিনি দেখেছেন এবং আমার মেয়েকে বিয়েও করতে রাজি আছেন। তিনিই পাত্র, বুঝলে? বিধবা-বিবাহ নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা হ'ল, ছেলেটির কথাবার্তা শুনে আমার বেশ ভাল লাগল। ছেলেটি দেখতেও বেশ ভদ্র;

নিরীহ। তারপর ছেলেটি বললে যে, বিধবা-বিবাহ করলে কিন্তু আত্মীয়-স্বজন সবাই তাকে ত্যাগ করবে। এক রকম নিঃসম্বল নিঃসহায় হয়ে পড়তে হবে তাকে। সুতরাং কিছু পণ চাই, অন্তত পাঁচ হাজার টাকা না পেলে তার পক্ষে এ বিবাহের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভবপর নয়। আমি ভেবে দেখলাম, কথাটা ঠিকই, সমাজকে তো চিনি। রাজি হয়ে গেলাম।

বৃদ্ধ আবার চুপ করিলেন।

মিণ্টুর দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, একমনে তরকারিই কুটিতেছেন। বৃদ্ধ আবার বলিয়া উঠিলেন, উঃ, সবই বরাত! আমার রোখ চ'ড়ে গিয়েছিল। ছোকরাটি বললে, সে গোপনেই বিয়ে করতে চায়, তাতেও রাজি হয়ে গেলাম। বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে যাবার মাস-খানেক পরেই ছোকরা একদিন নিরুদ্দেশ! কোনও পাত্তা নেই। তারপর শুনলাম এবং খোঁজ-খবর ক'রে জানলাম যে, কথাটা সত্যি, ছোকরার আরও দু-দুবার বিয়ে হয়েছে, পত্নী দুটিও জীবিতা। ভেবে দেখ একবার। মিণ্টু তারপর থেকে যে নিষ্ঠা শুরু করেছে, তা প্রায় আত্মহত্যারই সামিল, অর্থাৎ এই দারুণ গ্রীষ্মে নিরম্বু উপবাসটা, কিন্তু করবেই তো, মানে, ওর মনের অবস্থাটা—করবে না? আরে বাঃ!

বৃদ্ধ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম, আমি বুঝেছি সব। আপনি একটু স্থির হন।

স্থির হব বইকি। আমরা অতি ধীর স্থির বিচক্ষণ জাতি যে, আরে বাঃ, অস্থির হওয়া আমাদের ধাতেই নেই। একটু অস্থির প্রকৃতির হ'লে ওই জুয়াচোরটা এতদিন খুন হয়ে যেত, আর আমি এতদিন ফাঁসি যেতাম। কিন্তু আমরা রাজা-উজির মারি মুখে। সত্যি সত্যি মারি মশা আর ছারপোকা, ময়লা বিছানায় ব'সে ব'সে। আসল কাজ কিছু করতে পারি না। ইংলণ্ডের মেয়েরা কত অসতী, তারই হিসেব করতে আমরা ব্যস্ত, আমরা—

এমন সময়ে ফেন উথলাইয়া জ্বলন্ত স্টোভটা হঠাৎ নিবিয়া গেল। মিণ্টু উঠিয়া সেই দিকে গেলেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেদিকে একবার চাহিয়া আবার শুরু করিতেছিলেন। আমি কিন্তু উঠিয়া পড়িলাম।

মাখনবাবুদের রান্না বোধ হয় হয়ে গেছে, এইবার আমি যাই।

বাহির হইয়া আসিলাম। আসিবার সময় মিণ্টুর পানে একবার চাহিয়া দেখিলাম, কিছু দেখা গেল না। নির্বাপিত স্টোভটার সম্মুখে আমাদের দিকে পিছন করিয়া বসিয়া আছেন।

বাহিরে আসিতেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির সহিত দেখা হইল।

তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

অতিশয় সসঙ্কোচে এবং অত্যন্ত সবিনয়ে মাড়োয়ারী ভদ্রলোক যে কথাটি আমাকে বলিলেন, তাহাতে শুধু বিস্মিতই নয়, চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়িলাম। চলিতেছিলাম, দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল।

মাড়োয়ারীও দাঁড়াইলেন এবং উভয় হস্ত নাড়িয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে যে কথা আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন, তাহার মর্মার্থ গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব না হইলেও তদনুসারে কার্য করা সম্ভবপর ছিল না। সে কথা তাঁহাকে বলিতেই তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব করিলেন যে, আমাকে, মাখনবাবুকে এবং মাস্টার মহাশয়কে পান খাইবার জন্য কিছু দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন, কার্যটি কিন্তু করাইয়া দিতে হইবে।

ব্যাপার নিম্নলিখিতরূপ—

বন্‌শি হালুয়াই মাড়োয়ারীটির পূর্ব পরিচিত। সহসা এতগুলি লোকের ক্ষুধা মিটাইবার সঙ্গতি বন্‌শি হালুয়াইয়ের নাই। সুতরাং এই মরসুমে শেঠজীর সহিত বন্‌শির দেখা হইয়া যাওয়াতে রামজীর কৃপাই প্রমাণিত হইতেছে। ক্যাপিটালের জন্য আর তাহাকে ভাবিতে হইবে না। প্রাক্তন বন্ধু বন্‌শির উপকারার্থে শেঠজী শও দোশ খরচ করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। কিন্তু তৎপূর্বে তিনি আমাদের কৃপা-প্রার্থনা করিতে চাহেন। অর্থাৎ তিনি চাহেন যে, আমি, মাখনবাবু এবং মাস্টার মশাই

পান খাইয়া এমন একটা কাররোয়াই করি যে, ট্রেনখানা অন্ততঃ আরও চব্বিশ ঘণ্টা যেন এখানে পড়িয়া থাকে। তাহা না থাকিলে অনর্থক এতগুলা টাকা খরচ করিয়া আটা, ঘিউ এবং তরকারির জন্য চার ক্রোশ দূরবর্তী সাধুগঞ্জের বাজারে যাওয়ার কোনও অর্থ হয় না। কাছাকাছি যত আটা, ঘি এবং তরকারি ছিল বন্‌শি সব কিনিয়া লইয়াছে এবং তাহাও নিঃশেষিতপ্রায়। সাধুগঞ্জে যাইবার জন্য সে শেঠজীকে পীড়াপীড়ি করিতেছে। শেঠজীরও যাইতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তৎপূর্বে তিনি আমাদের কৃপা প্রার্থনা করেন। ইচ্ছা করিলে পান অবশ্য আমরা খাইতে পারি।

আমি জানাইলাম, আমাকে এসব কথা বলা বৃথা, কারণ আমিও একজন প্যাসেঞ্জার মাত্র। মাখনবাবু বা মাস্টার মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা নিতান্তই আকস্মিক।

ইহা শুনিয়া তিনি মোটেই বিচলিত হইলেন না। মৃদু মৃদু মাথা নাড়িয়া অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে তিনি যাহা বলিতে লাগিলেন, তাহার প্রতিবাদের ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি এমন কোন উক্তি করিলেন না, যাহা যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা যায়। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, আমার সহিত মাখনবাবু ও মাস্টার মহাশয়ের যে কোনও সম্পর্ক নাই, তাহা তিনি অবগত আছেন। সমস্ত পাকা খবরই তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ইহাই সার বুঝিয়াছেন যে, আমি যদি মাখনবাবু ও মাস্টার মহাশয়কে একটু অনুরোধ করি, তাহা হইলেই কার্যটি নিষ্পন্ন হইয়া যায়।

এ কথা তিনি ভাল করিয়া জানিয়াই তবে আমার নিকট আসিয়াছেন।

সামান্য পান খাইতে আপত্তি কি ?

বুঝিলাম, এখানে সত্যভাষণ নিষ্ফল।

একটু কৌতুক-বোধও হইল।

বলিলাম, আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখছি।

বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। একটু গিয়া দেখিলাম, তিনি পিছু পিছু আসিতেছেন। তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলাম যে, তিনি যদি পিছু পিছু আসেন, তাহা হইলে কিন্তু কার্যসিদ্ধি হওয়া শক্ত। এ কথায় যাদুমন্ত্রের মত কাজ হইল। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গ ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু যাইবার পূর্বে বলিয়া গেলেন যে, আমার দয়ার উপর ভরোসা করিয়া তিনি তাহা হইলে সাধুগঞ্জের হাট অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।

হাসিয়া উত্তর দিলাম, আচ্ছা।

নমস্কার।

ফিরিয়া দেখি সেই বেঁটে ভদ্রলোক। একটি লাল রঙের কোট বাহির করিয়া পরিধান করিয়াছেন। হাতেও একটি বেঁটে গোছের বর্মা-চুরুট। এত বেঁটে বর্মা-চুরুট ইতিপূর্বে দেখি নাই।

তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আগাইয়া গেলাম।

কিছুদূর গিয়াই মাখনবাবুর সহিত দেখা হইল।

তিনি আমাকে ডাকিতে আসিতেছিলেন। দূর হইতেই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ভীষণ কাণ্ড মশাই, শিগ্‌গির আসুন।

কি হ'ল?

আরে, ওই যে মেয়েটা আপনি রেখে গেলেন, ও মুচীর মেয়ে। ভাগ্যে রান্নাঘরে ঢোকে নি, ঢুকলে তো সব হাঁড়িকুড়ি ফেলে দিতে হ'ত! কি মুশকিল! অজ্ঞাত-কুলশীলকে এইজন্যেই আশ্রয় দিতে নেই, শাস্ত্রে বলেছে। আরে, না না, আপনাকে অত কাঁচুমাচু হতে হবে না। আপনার দোষ কি? বাইরে থেকে দেখে তো কিছু বোঝবার জো নেই আজকালকার দিনে —সবাই ফিটফাট।

আমি শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বুঝলেন কি ক'রে?

আরে, সে নিজেই বললে কিনা! এ ধারে মেয়েটি বেশ ইয়ে আছে।

নিজেই বললে?

হ্যাঁ। বিন্নু খাওয়ার জন্যে খুব জিদ করতে লাগল। তখন মেয়েটি বললে যে, আমি তা হ'লে আপনাদের থালা-গেলাস এঁটো করব না, সব জেনে-শুনে যদি এঁটো করতে দেন, তা হ'লে

অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু আমার প্রথমেই আপনাদের জানানো উচিত যে, আমি মুচীর মেয়ে। এই শুনেই তো বিন্নুর পিলে চমকে গেল।

বলিয়া মাখনবাবু হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটি এখন আছে কোথায়? আপনাদের বাড়িতেই?

মাখনবাবু আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, নো নো, সার্। ভয় নেই, সে নিজেই চ'লে গেছে।

কোথায়?

আলগোছে একখানা নিমকি খেয়ে সে ওই রাস্তাটা দিয়ে চ'লে গেল। ব'লে গেল, আমি গ্রামের ভেতরটা একটু ঘুরে আসি। জিনিসপত্র সব আমার বাসাতেই প'ড়ে আছে।

কি বলিব কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না।

মাখনবাবু অনর্গল বকিয়া যাইতেছিলেন।

আজ সব মাটি হয়েছিল আর একটু হ'লে!

রামদীন ব্যাটা গ্র্যাণ্ড পাবদামাছ যোগাড় ক'রে এনেছে, আর বিন্নু করেছে তার ঝাল। বিন্নুর হাতের ঝাল কোনদিন খান নি, খেলে আর ভুলতে পারবেন না। সিম্প্লি বিউটিফুল! ও বেটী ছুঁয়ে দিলেই সব ভেস্তে গিয়েছিল আর একটু হলে!

মাখনবাবুর বাড়ির কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলাম।

মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, চান করবেন তো আপনি ?

ইচ্ছে তো আছে। কিন্তু এখন আবার কাপড়টা ভিজাব কি না ভাবছি।

কাপড় দিচ্ছি আমি মশাই, চান করুন। চান না করলে চলে এই গরমে ?—বলিয়া মাখনবাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম, মাখনবাবু বলিতেছেন, এ কি, পাবদামাছগুলো এখনও কিছু কর নি ? তোমাকে ব'লে গেলাম ঝাল করতে—

এ বেলা থাক্ না আর কালকের বাসী মাছের টক তো আছে এক খোরা। পাবদাগুলো বরং ভেজে রাখি, ওবেলা হবে। শরীরটাও ভাল নেই, কেমন যেন জ্বর-জ্বর করছে।

না না, তা কি হয় ? ভাল ক'রে ঝাল কর মাছগুলোর। ভদ্রলোককে আমি বললাম যে, তোমার হাতের ঝাল খেলে তিনি জীবনে সে কথা ভুলতে পারবেন না।

আহা !

কর কর, বুঝলে ?

উনুন তো নিবে গেছে। তোমার যত সব অনাছিষ্টি !

কুছ্ পরোয়া নেই, রামদীনকে ডেকে দিচ্ছি।

আমি দেখিলাম, এ ভাবে দাঁড়াইয়া দাম্পত্যালাপ চুরি

করিয়া শোনাটা ঠিক নয়। একটু সরিয়া পায়চারি করিতে লাগিলাম। মিনিট-খানেক পরেই মাখনবাবু একখানা কাপড়, গামছা এবং একটা চায়ের পেয়ালায় করিয়া খানিকটা তৈল লইয়া দর্শন দিলেন।

তেল মাখিতে মাখিতে প্রশ্ন করিলাম, কাছাকাছি পুকুর কোথাও আছে ? একটা ডুব দিয়ে আসতাম তা হ'লে।

মাখনবাবু বলিলেন, খুব কাছাকাছি নেই। তবে একটু দূরে গেলেই, আধ মাইল-টাক, একটা ভাল পুকুর পেতে পারেন। এই যে রাস্তাটা সোজা চ'লে গিয়ে ওই মন্দিরটার পাশ দিয়ে বেঁকে গেছে, ওই রাস্তা। মন্দিরটার পাশ দিয়ে গিয়ে রাস্তাটা দু দিকে ভাগ হয়ে গেছে, আপনি বাঁ দিকেরটা ধ'রে সোজা চ'লে গেলেই পুকুর পাবেন। বেশ ভাল পুকুর। যান, তা হ'লে দেরি করবেন না।

মাথায় একটু তেল চাপড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, রাস্তার মোড়টায় যেখান হইতে আমাকে বাঁকিয়া পুকুরের রাস্তা ধরিতে হইবে, সেইখানটায় অনেকগুলি লোক জমিয়াছে এবং একটা গোলমাল হইতেছে।

দ্রুতপদেই যাইতেছিলাম, গতিবেগ আরও একটু বাড়াইলাম।

ভিড়ের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলাম, একটা গরুর গাড়ির একটা চাকা রাস্তার পাশের একটা গর্তে পড়িয়া গিয়াছে। শীর্ণ

গরু দুইটি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের সাধ্যে কুলাইতেছে না।

গাড়োয়ান সে কথা শুনিবে কেন ?

তাহার হাতে লাঠি আছে, গায়ে শক্তি আছে। সে প্রাণপণে লাঠিবাজি ও গলাবাজি করিয়া লোক জমাইয়া ফেলিয়াছে। লোকও দেখিলাম জমিয়াছে অনেকগুলি, আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই এই পাঁজর-বাহির-করা ঘাড়ে-ঘা বলদ দুইটির বদমায়েশি সকৌতুকে নিরীক্ষণ করিতেছে। আশ্চর্য পাজি গরু ! এত মার খাইতেছে, তবু জোর করিয়া টানিয়া গাড়িটাকে গর্ত হইতে তুলিবে না !

পেজোমি তোদের বের করছি, থাম্।

ক্রুদ্ধ গাড়োয়ান তড়াক করিয়া লাফাইয়া পড়িল এবং গাড়ির সামনে গিয়া গরু দুইটির মুখের উপর নাকের উপর লাঠি চালাইতে লাগিল। গাড়োয়ান এবং দর্শকবৃন্দ সকলেই হিন্দু। গোজাতির উপর তাহাদের শাস্ত্রীয় অধিকার আছে। বলিবার কিছু নাই।

গাড়োয়ানের হাত ব্যথা হয় নাই। সুতরাং সে হাত চালাইতেছিল। আমি আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলাম, ওহে, আর মেরো না। এস, বরং আমরা সবাই মিলে ঠেলে-ঠুলে গাড়িটাকে তুলে দিই ওপরে।

আরে, থামেন বাবু আপনি। এ গরুকে আপনি চেনেন না। দেখুন না, আমি শায়েস্তা ক'রে তবে ছাড়ব।

বলিয়া সে আবার মার শুরু করিল।

চোড় দেও। মৎ মরো।

দেখি, সেই কাবুলিওয়ালা আসিয়া হাজির হইয়াছে।

চোড়ো।

সে তাহার বলিষ্ঠ দেহ লইয়া আগাইয়া গেল, এবং প্রথমেই গিয়া গরু দুইটাকে খুলিয়া দিল।

এই আগা সাহেব, কেয়া করতা ?—বলিয়া গাড়োয়ান প্রথমটা একটু বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কাবুলিওয়ালার মুখে সে যে ভাব দেখিল, তাহাতে সে আর বেশি কিছু বলা নিরাপদ মনে করিল না।

তুম আদ্‌মি নেহি, জানবর হ্যায়।

বলিয়া কাবুলী গরু দুইটিকে হাঁকাইয়া নিকটেই বাঁধিয়া রাখিয়া আসিল। এইবার সে আমাকে দেখিতে পাইল। সেলাম করিয়া সহাস্যে সে বলিল, আইয়ে বাবুসাব, থোড়া হাত লাগা দিজিয়ে।

বলিয়া সে নিজেই প্রথমে গিয়া জোয়ালে কাঁধ দিল। তাহার দেখাদেখি গাড়োয়ান এবং আরও দুই-একজন আগাইয়া গেল। আমি এবং আর বাকি সকলে গাড়িটার পিছন হইতে ঠেলিতে লাগিলাম। অনেক ঠেলাঠেলির পর গাড়িটা পথে উঠিল। কার্য সমাধা করিয়া কাবুলিওয়ালা পস্তু ভাষায় খানিকটা কি বলিয়া গেল, বুঝিলাম না, য, ঝ এবং 'Z'-এর ঝড় বহিয়া গেল। পরিশেষে সে আমাকে আবার সেলাম করিয়া

বিদায় লইল, কহিল, এ ট্রেনে সে যাইবে না, কারণ ট্রেন ছাড়িবার কোনই ঠিক নাই। উপস্থিত সে গ্রামান্তরে যাইতেছে।

কাবুলিওয়ালা চলিয়া যাইবার পর গাড়োয়ান গজর-গজর করিতে লাগিল।

উঃ, শালা গোঁয়ার এসে আমার সব নয়-ছয় ক'রে দিয়ে গেল! মাল গেছে প'ড়ে, একবেলা যাবে এখন কুড়োতে। এই এই, একটি দানায় কেউ হাত দিও না বলছি।

সত্যই পিছনের একটা ফাটা বস্তা হইতে কিছু ছোলা রাস্তার ধূলার উপর পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহার উপর হুমড়ি খাইয়া কয়েকজন পড়িয়াছিল বোধ হয় কুড়াইয়া দিবার জন্যই। কিন্তু গাড়োয়ান তাহাদের এই উপচিকীর্ষাকে আমল দিল না, দাঁত খিঁচাইয়া তাড়া করিয়া গেল।

পার্শ্ববর্তী একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আগা সাহেব এই অঞ্চলেই থাকে নাকি?

সে বলিল যে, আগা সাহেব কোথায় যে থাকে, তাহা তাহার জানা নাই, তবে এই অঞ্চলে সে প্রায়ই ঘোরে। অনেকেই তাহার কাছে টাকা ধার লয়। অত্যন্ত চড়া সুদ। মাসিক টাকা প্রতি দুই আনা। তাহার পর নিম্নস্বরে সে জানাইয়া দিল যে, এই মঙ্গল গাড়োয়ানই তাহার নিকট টাকা ধারে। তাই তাহার কার্যে বাধা দিতে সাহস পাইল না। তাহা না হইলে—

আমার আর বেশি শুনিবার আগ্রহ ছিল না। মাখনবাবুর নির্দেশমত বাম দিকের রাস্তাটা ধরিয়া মাঠের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম।

কিছুদূর গিয়াই সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের বুক চিরিয়া একটি পায়ে-চলা সরু পথ বিসর্পিত রেখায় দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে। কাছে দূরে কতকগুলি গরু চরিতেছে। পাশেই কয়েকটি রাখাল-বালক ডাং-গুলি খেলিতেছে। তাহাদেরই একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, পুকুরটা কোন্ দিকে? তাহারা বলিল যে, সোজা কিছুদূর গেলেই পাওয়া যাইবে।

উদার বিস্তীর্ণ মাঠে চলিতে চলিতে মনটা কেমন যেন উদাস হইয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম, মেঘলেশহীন নীলাম্বর খর-রৌদ্রে পুড়িয়া যাইতেছে। বহু ঊর্ধ্বে চক্রাকারে কতকগুলি শকুনি উড়িয়া বেড়াইতেছে। একটা গরুর পিঠে একটা কাক বসিয়া তাহার পুরাতন ক্ষতটাকে ঠোকরাইয়া রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। আরও একটু দূরে গিয়া দেখিলাম, বিস্ফারিত-চঞ্চু শালিক-দম্পতি আমাকে দেখিয়া উড়িয়া গেল।

রৌদ্র-দগ্ধ ধূসর মাঠের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছি।

পুষ্করিণী কতদূরে আছে, কে জানে!

৯

স্নান সমাপন করিয়া উঠিয়াছি, এমন সময় মনে হইল, পুকুরের ওপারে সেই মেয়েটি যেন একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে বোধ হয় দেখিতে পায় নাই। ওপারে একটা গাছের তলায় হেঁট হইয়া একমনে কি যেন কুড়াইতেছে। একটা কি যেন গাছ রহিয়াছে ওপারে।

সিক্ত কাপড়টি কাচিয়া গামছায় বাঁধিয়া ওপারের দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। একটু দূরে গিয়াই বুঝিলাম, সেই মেয়েটিই বটে।

কাছাকাছি হইতেই মেয়েটি আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল। আমি নমস্কার করিলাম। মেয়েটি প্রতি-নমস্কার করিয়া নীরব হইয়া রহিল। নীরবতা আমাকেই ভঙ্গ করিতে হইল। মেয়েটির বয়স কম, তাহাকে 'তুমি' বলিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাহার মুখে চোখে এমন কি একটা আছে যে, বলিতে বাধে। বলিলাম, এখানে একা একা কি করছেন?

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, জাম কুড়োচ্ছি। কেমন সুন্দর জাম দেখুন তো!

সত্যই বেশ সুন্দর বড় বড় জাম। অনেকগুলিই সংগ্রহ করিয়াছে দেখিলাম।

খাবেন? নিন না!

না, এখন আর খাব না। আমাকে ভাত খেতে হবে এখুনি গিয়ে। চান করতে এসেছিলাম।

মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসিয়া বলিতে লাগিল, আমার জাতের কথা টের পেয়ে গেছেন বুঝি? ফলের বেলায় তো দোষ নেই শুনেছি। আমার মা ঝুড়ি করে জাম, বৈঁচি, কুল ফেরি ক'রে বেড়াতেন।

না না, সে জন্যে নয়। আমার নিজের ওসব কোন সংস্কার নেই। আচ্ছা দিন দু-চারটে, তা না হ'লে আপনার বিশ্বাস হবে না।

জাম চিবাইতে চিবাইতে বলিলাম, এখানে একা একা কি করবেন? চলুন, স্টেশনের দিকেই যাওয়া যাক।

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল।

বাঃ, ওই দিকে একটা কি সুন্দর জাম প'ড়ে রয়েছে, দেখুন! থামুন, আনি ওটাকে।

পাশেই একটা কাঁটা-ঝোপের ভিতর একটা পাকা পুষ্ট জাম পড়িয়া ছিল। মেয়েটি অতি সন্তর্পণে ঝুঁকিয়া হাত বাড়াইয়া সেটিকে হস্তগত করিল।

বলিলাম, এইবার চলুন তা হ'লে।

আপনি যান। আমি এখন যাব না, একটু পরে আসছি।

ইহার পর আমার চলিয়া আসাই উচিত ছিল। কিন্তু মাখনবাবুর বাড়ি হইতে মেয়েটির অকস্মাৎ অন্তর্ধানে মনে আঘাত পাইয়াছিলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে ইহাকে আবার এখানে পাইয়া ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিল না।

মুচীর মেয়ে? মুচীর ঘরে এমন মেয়ে হয়, তাহা আমার

জানা ছিল না। মেয়েটির চোখে মুখে এমন একটা বুদ্ধির জ্যোতি রহিয়াছে, যাহা ভদ্র মেয়েদের মুখেও খুব বেশি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবার বলিলাম, মাখনবাবুর স্ত্রী আপনাকে ঠিক কি বলেছেন জানি না, কিন্তু আমাদের সাধারণ হিন্দু-ঘরের প্রচলিত সংস্কার কাটিয়ে ওঠা সকলের পক্ষে সহজ নয়! এটা আপনার বোঝা উচিত।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি প্রতিবাদের স্বরে বলিল, না না, মাখনবাবুর স্ত্রী আমাকে তেমন কিছু তো বলেন নি। বললেই বা কি করতুম? মুচীর মেয়ে হয়ে এ দেশে এর চেয়ে আর বেশি কি সম্মান আশা করতে পারি, বলুন?

আমি বলিয়া ফেলিলাম, আপনাকে দেখে সত্যি কিন্তু মুচীর মেয়ে ব'লে মনে হয় না। সত্যি বলছি। মেয়েটি গাছের ও-পাশটায় সরিয়া গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বোধ হয় আর একটা জাম কুড়াইতে গেল। তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম না। রঙিন কাপড়ের প্রান্তটুকু শুধু দেখা যাইতেছিল। আমিও ঘুরিয়া গাছের ও-পাশটায় গেলাম। গিয়া বলিলাম, চলুন চলুন, এখানে একা নির্জন মাঠের মাঝে থাকা ঠিক নয়।

নির্জন জায়গাই আমাদের পক্ষে নিরাপদ। কেন আপনি আমাকে শুধু শুধু বিপদের মধ্যে ডেকে নিয়ে যেতে চাইছেন? প্ল্যাটফর্মের ওপর অসভ্য এক দল ছেলে বিরক্ত করছিল, তাই দেখে আপনি নিয়ে গেলেন এক ভদ্রলোকের বাসায়। সেখান

থেকেও ফিরে আসতে হ'ল। তার চেয়ে আমি এইখানে বেশ তো আছি।

আপনি বেশ আছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আপনাকে এখানে এ রকম ভাবে ফেলে রেখে যেতে আমার কেমন ইচ্ছে হচ্ছে না।

না না, ও কিছু নয় আপনি যান। আমার জন্যে এতটা কষ্ট স্বীকার করছেন, এর জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

বেশ তো, ধন্যবাদ আপনার গ্রহণ করলাম; কিন্তু এবারে চলুন। আপনাকে এই মাঠের মাঝখানে একা ফেলে রেখে আমি যাব না। আপনি যদি না যান, এই আমিও বসলাম।

বলিয়া নিকটস্থ একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িলাম।

একটি জাম মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া মেয়েটি হাসিয়া বলিল, আচ্ছা একগুঁয়ে লোক তো আপনি! আমার জন্যে এতখানি কষ্ট স্বীকার আপনি কেন করছেন বলুন দেখি? হাড়ী-মুচীর কত মেয়ে রাস্তায় ঘাটে কত ভাবে তো রোজ অপমানিত হচ্ছে, সকলের জন্যে আপনি তো এতটা ব্যস্ত হন না! আমার জন্যেই বা এতটা ব্যস্ত হতে আমি দেব কেন আপনাকে? একজন নীচজাতীয়ার জন্যে ব্যস্ত হবার কারণই বা কি থাকতে পারে?

জাত আপনার যাই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না।

আপনাকে নিজেদের সমশ্রেণীর ব'লে মনে হচ্ছে, তার প্রধান কারণ বোধ হয় আপনি ফরসা জামা-কাপড় প'রে রয়েছেন।

আর কোন কারণ নেই তো?

প্রশ্নটা শুনিয়া মনে মনে একটু লজ্জা পাইয়া গেলাম। মুখে বলিলাম, কারণ হয়তো অনেকগুলিই আছে। সবগুলো না-ই শুনলেন।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

নিতান্তই ছাড়বেন না যখন, চলুন তবে।

চলুন।

নির্জন মাঠের ভিতর দিয়া খর-রৌদ্রে দুইজনে হাঁটিয়া চলিয়াছি। দুইজনেই নির্বাক।

নীরবতাই ভাষাময় হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি করেন কি?

আমি পড়ি।

কি পড়েন? কোথায়?

কলকাতায়, মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ি।

ও, সেইজন্যেই ঠিক ডায়াগ্‌নোসিস করেছেন।

মেয়েটির মুখে ইংরেজী কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলাম।

কিসের ডায়াগ্‌নোসিস?

থাক্, ও কিছু নয়।

বলিয়া একটু হাসিয়া মেয়েটি চুপ করিয়া গেল।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল।

কাহারও মুখে কথা নাই।

একটু পরে মেয়েটিই আবার কথা কহিল।

আপনাকে একটা কথা বলছি। কাউকে বলবেন না কিন্তু। আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি মুচীর মেয়ে নই, আমি কায়স্থের মেয়ে।

দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

কায়স্থের মেয়ে? তবে আপনি নিজেকে মুচীর মেয়ে ব'লে পরিচয় দিলেন কেন?

শুনিয়া মেয়েটি একটু হাসিয়া বলিল, আপনি মহাভারত নিশ্চয়ই পড়েছেন। কুন্তীপুত্র কর্ণ চিরকাল নিজেকে অধিরথ-সূত ব'লে পরিচয় দিতেন, তা জানেন তো? আমারও অবস্থা অনেকটা তাই।

কি রকম?

দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? চলুন না, যেতে যেতে সব বলছি।

চলিতে লাগিলাম।

মেয়েটিও বলিতে লাগিল, আমার বাপ-মায়ের নাম আমি বলব না। কোথায় আমাদের বাড়ি, তাও আপনার জানবার দরকার নেই। এইটুকু শুধু জেনে রাখুন যে, ভদ্র কায়স্থ-ঘরে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমার মা উপর্যুপরি দশটি মেয়ে

প্রসব করার পর আমাকে প্রসব করেছিলেন। আমাকে প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গেই মা অজ্ঞান হয়ে যান। সেই সুযোগে আমার ঠাকুমা তখন নাকি আঁতুড়-ঘরেই আমাকে বিলিয়ে দেন—সেই ধাত্রী হাড়িনীকে। বাবারও নাকি তাতে মত ছিল। মায়ের জ্ঞান হবার পর মাকে জানানো হয় যে, একটা মরা মেয়ে হয়েছিল এবং তা ফেলে দেওয়া হয়েছে।

বলিয়া মেয়েটি হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

তারপর?

তারপর আর কি! আমিই সেই একাদশ কন্যা।

এ রকম অসম্ভব কথা জীবনে কখনও শুনি নাই।

মেয়েটি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? না হবারই কথা। এর একটি বর্ণ কিন্তু মিথ্যে নয়। খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল।

বলিবার কিছু ছিল না। মনে হইতেছিল, এসব প্রসঙ্গ না তুলিলেই বোধ হয় ভাল হইত। মনে হইতেছিল, মেয়েটিকে অবিশ্বাস করিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যাইতাম। কিন্তু অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। সমাজকে তো চিনি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, হাড়ী আর মুচী এক নাকি? আপনি পরিচয় দিচ্ছেন মুচীর মেয়ে ব'লে, অথচ বলছেন আপনার ঠাকুমা হাড়িনীকে—

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, আপনি ভুল লাইন ধরেছেন।

ডাক্তার না হয়ে উকিল হ'লে আপনার বেশি পশার হ'ত। ঠাকুমা বিলিয়ে দিয়েছিলেন হাড়িনীকে, হাড়িনী আবার আমাকে বিক্রি ক'রে দেয় এক মুচীকে। মুচীর বাড়িতেই আমি মানুষ হয়েছি, মুচী মায়ের দুধ খেয়েই আমার এই দেহ পুষ্ট।

আমার কিন্তু একটা বিষয়ে খুব আশ্চর্য লাগছে, মুচীর বাড়িতে আপনি এ রকম শিক্ষা পেলেন কি ক'রে?

কেন, মুচীরা মানুষ নয় নাকি?

মেয়েটির চোখে একটা ক্রূর ব্যঙ্গ যেন ক্ষণিকের জন্য মূর্ত হইয়া উঠিল।

মানুষ নয়, তা আমি বলছি না।

এই সব মুচী-মেথররা আধমরা ভদ্রলোকদের চেয়ে ঢের বেশি জীবন্ত, তা জানেন? তবে এটা ঠিক, মুচীর ঘরে বরাবর থাকলে আমি লেখাপড়াও শিখতে পারতাম না, কিছুই না। ভাগ্যে ক্রিশ্চান মিশনারিরা এ দেশে এসেছিল, তাই আমাদের গতি হয়েছে।

আপনি ক্রিশ্চান নাকি?

হ্যাঁ, আমি ক্রিশ্চান। মিস মার্থা দাস এখন আমার নাম। আমি কিন্তু মুচীর মেয়ে ব'লেই নিজের পরিচয় দিতে ভালবাসি—বিশেষতঃ হিন্দু-সমাজে।

মেয়েটির চোখের দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্য একটা ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ যেন চকমক করিয়া উঠিল।

আপনার বাপ-মা এখনও বেঁচে আছেন ?

না, তাঁরা মারা গেছেন শুনেছি। অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছেন জানি না, খোঁজ নিতে প্রবৃত্তিও হয় না। ক্রিশ্চান মিশনারিদের কাছেই আমি মানুষ। তাদেরই আশ্রয়ে ছেলেবেলাটা আমার মাদ্রাজ অঞ্চলে কেটেছে, শুধু ছেলেবেলা কেন, এ দেশে আমি অল্প কয়েক দিনই হ'ল এসেছি।

বাংলা ভুলে যান নি তো ?

আমাদের এক মিশনারি মেম সুন্দর বাংলা জানতেন। তিনিই আমাকে বাংলা পড়িয়েছিলেন খুব যত্ন ক'রে। তিনি বলতেন, আমি বাঙালীর মেয়ে, বাংলাটা আমার ভাল ক'রে শেখা উচিত। তাঁর কাছে আমি বাইবেলও যেমন পড়েছিলাম রামায়ণ-মহাভারতও পড়েছিলাম। তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ না থাকলে আমার বাঙালীত্বও এত দিনে লোপ পেয়ে যেত।

জিজ্ঞাসা করিলাম, এ দেশে আপনি ফিরে এসেছেন আবার কি সূত্রে ?

একটু দরকার আছে।

বলিয়া মেয়েটি একটু যেন লজ্জিত হইল।

আমি আবার প্রশ্ন করিলাম, আপনি এ দেশের মেয়ে হয়ে মাদ্রাজে চ'লে গেলেন কি ক'রে ?

সে অনেক কথা। আমার মুচী বাবা আর মুচি মা এ দেশে অন্ন-সংস্থান না করতে পেরে মাদ্রাজের দিকে চ'লে যান একটা চাকরি পেয়ে। আমার বাবা জুতোর খুব ভাল কারিগর

ছিলেন। সেখানেও কিন্তু তাঁরা সুখে থাকতে পারেন নি। আমার বাবা অত্যন্ত মাতাল ছিলেন। সে অনেক কথা। ক্রমে তাঁর চাকরিটি গেল। মহাকষ্ট। শেষকালে এক পাদ্রীর অনুগ্রহে শেষ-জীবনটা তাঁরা একটু শান্তি পেয়েছিলেন। সেই সময়েই আমরা সবাই ক্রিশ্চান হয়ে যাই।

স্টেশনের নিকটবর্তী হইয়াছিলাম।

মেয়েটি বলিল, এলাম তো আপনার সঙ্গে, এখন যাই কোথায় বলুন তো? সকলের ব্যবহার দেখে বড় কষ্ট পাই, সত্যি বলছি। নিজেকে বাঙালী ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা করে।

আমি বলিলাম, আপনি মাখনবাবুর বাসাতেই আসুন না। তাতে কি হয়েছে?

না না, মাপ করবেন, আমি এখন ওখানে যাব না। বিশেষতঃ এখন আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার সময়।

মেয়েটি সোজা প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকেই আগাইয়া গেল। আমি মাখনবাবুর বাড়ির দিকে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, মাখনবাবু নিজেই রান্না করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। আমার সাড়া পাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ধোঁয়ায় দুই চক্ষু লাল, জল পড়িতেছে। কোমরে গামছা বাঁধা, কাপড়ে হলুদের ছোপ, হাতে হাতা। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, আপনার দেরি দেখে একটু পায়েস চড়িয়ে দিলাম। হয়ে গেল ব'লে, আর দেরি নেই, টেন মিনিট্‌স্।

বলিয়া আবার তিনি ধূমাচ্ছন্ন রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। রান্নাঘর হইতেই চীৎকার করিয়া বলিলেন, আমার ঘরে টেবিলের ওপর আয়না চিরুনি আছে।

ঘরে ঢুকিতেই মাখনবাবুর স্ত্রী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মনে হইল, তিনি যেন শুইয়া ছিলেন। শুনিলাম, তাঁহার শরীর খারাপ।

## ১০

আহারাদির পর দেখা গেল, বেলা তিনটা বাজিয়াছে। পাবদামাছের ঝাল সত্যই ভাল হইয়াছিল। পান চিবাইতে চিবাইতে মাখনবাবু বলিলেন, আপনি একটু বসুন সার্, আমি দেখে আসি, রামদীন ব্যাটা কতদূর কি করলে! আপনি শুয়ে পড়ুন না ততক্ষণ।

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, আপনার স্ত্রীর খাওয়া হয়ে গেছে কি? তাঁর শরীরটা ভাল নয়, শুনলাম।

হ্যাঁ, শরীরটা তেমন সুবিধে নেই, বলছিল। মুড়ি দিয়ে তো পাশের ঘরটায় শুয়েছে। জ্বর-টর এসেছে বোধ হয়। ম্যালেরিয়ায় তো প্রায়ই ভোগে। আচ্ছা, দেখি, দাঁড়ান।—বলিয়া মাখনবাবু পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

একটু পরে পাশের ঘর হইতেই আমাকে ডাকিলেন, শুনে যান।

গেলাম। গিয়া দেখি, মাখনবাবুর স্ত্রী জ্বরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন। কপালে হাত দিয়া দেখিলাম, গা পুড়িয়া যাইতেছে।

মাথায় জলপটি দিয়া হাওয়া করিতে বলিলাম। শশব্যস্ত হইয়া মাখনবাবু বলিলেন, সিরিয়াস বুঝছেন নাকি কিছু?

না, জ্বরটা একটু বেশি হয়েছে কিনা, তাই ওই রকম ক'রে রয়েছেন। কুইনিন পাওয়া যাবে এখানে?

ছিল তো আমার কাছেই কয়েকটা গুলি। দেখি, দাঁড়ান। ও-ঘরে র‍্যাকটায় ছিল, মনে হচ্ছে।

আপনি আগে মাথায় জল দিয়ে ভাল ক'রে বাতাস করুন। আমি দেখছি র‍্যাকটা খুঁজে। ফিরিয়া আসিয়া র‍্যাকটা খুঁজিয়া দেখিলাম। একটি খালি কুইনিনের টিউব রহিয়াছে। কুইনিন নাই।

মাখনবাবু এই শুনিয়া ও-ঘর হইতেই চীৎকার করিয়া বলিলেন, মাস্টার মহাশয়ের বাসায় পাওয়া সম্ভব। মাস্টার মহাশয়ের বাসাতে গেলাম। পাশের বাড়ি। সেখানে গিয়া দেখি, মাস্টার মহাশয় বাসায় নাই, স্টেশনে গিয়াছেন। একটি দশ বছরের ছেলে বাসা হইতে বাহির হইয়া এই খবরটি দিল। তাহাকে বলিলাম যে, মাখনবাবুর স্ত্রীর খুব জ্বর হইয়াছে, বাড়িতে যদি কুইনিন থাকে একটু চাই। খোকা বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরেই কুইনিন-পিল কয়েকটা লইয়া হাজির হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলাম, একটি

আধময়লা-কাপড়পরা আধঘোমটা-দেওয়া মহিলাও বাহির হইলেন এবং একটু দূরে আমার পিছু পিছু আসিতে লাগিলেন।

মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী বোধ হয়।

ফিরিয়া দেখি, মাথায় জল দেওয়াতে বিন্নুর জ্ঞান হইয়াছে। মাখনবাবু প্রাণপণ শক্তিতে হাওয়া করিয়া চলিয়াছেন।

পেলেন কুইনিন সার্?

হ্যাঁ, পেয়েছি।

মাস্টার মশায়ের হ'ল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, এই যে স্বয়ং লক্ষ্মীও এসে হাজির হয়ে গেছেন দেখছি। আস্থন বউদি, চাঙ্গা ক'রে তুলুন। এসব আমার কর্ম নয়।—বসিয়া মাখনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী বিন্নুর শিয়রে গিয়া বসিলেন।

বাস্, নিশ্চিন্দি। এইবার দেখা যাক, রামদীন ব্যাটা কতদূর কি করলে! হ্যাঁ, কুইনিনটা কি এখনই দিয়ে দিতে হবে?

দিলেই ভাল হয়, দুটো পিল দিন।

আমার হাত হইতে কুইনিনের পিলগুলি লইয়া মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রীর হাতে সেগুলি দিয়া মাখনবাবু বলিলেন, শুনলেন তো? দুটো পিল দিয়ে দিন এখুনি, জাস্ট নাউ। বুঝলেন?

মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী ঘাড় কাত করিয়া জানাইলেন যে, তিনি বুঝিয়াছেন; এবং ফিসফিস করিয়া বলিলেন যে, আমরা বাহিরে গেলেই তিনি পিল দুইটি খাওয়াইয়া দিবেন।

মাখনবাবু আমাকে বলিলেন, চলুন সার্, তবে বাইরে যাই। বউদি এসে গেছেন যখন, তখন আর কিছু দেখবার দরকার নেই। কিছুক্ষণ পরে চাই কি উনি চা-ও খাইয়ে দেবেন আমাদের।

ফিসফিস করিয়া বউদি আবার বলিলেন, ও-বাড়িতে যান না, চায়ের জল বসানোই আছে। খোকনকে বলিলেই সে সব ঠিক ক'রে দেবে।

সস্মিত দৃষ্টিতে মাখনবাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, শুনলেন তো ?

চলুন আমরা বাইরে যাই।—বলিয়া আমি মাখনবাবুকে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিলাম। মাখনবাবু বলিলেন, রামদীন ব্যাটা কতদূর কি করলে, একবার দেখতে হচ্ছে। ব্যাটাকে একটা টাকা দিয়েছি তো অনেকক্ষণ হ'ল।

কেন ?

ড্রাইভার ব্যাটাকে যদি ফুসলে-ফাসলে মদ খাওয়াতে পারে।

হঠাৎ আমার মনের ভিতরটাতে কে যেন একটা মোচড় দিয়া গেল। এই চক্রান্তে সত্যই যদি ড্রাইভারের চাকরিটা যায় ? আমি অনর্থক ইহার মধ্যে নিজেকে জড়াইলাম কেন ? নিতান্ত নিরীহ একটা লোককে ষড়যন্ত্র করিয়া এমন ভাবে—

কি ভাবছেন সার্ ?

কিছু না।

এমন সময় দূরে দেখা গেল, সেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। আমাদের দেখিয়া আবার সেলাম করিলেন। ইঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সব মনে পড়িয়া গেল। মাখনবাবুকে বলিলাম, আবার এক ফ্যাসাদে পড়েছি মশাই।

কি ফ্যাসাদ ?

আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা মাখনবাবুকে বলিলাম। মাখনবাবু নির্বিকারচিত্তে বলিলেন, কত টাকা দিতে চায় ?

সে দরদস্তুর তো করি নি। টাকা নেবেন নাকি সত্যি ?

সার্‌টেন্‌লি ! টাকা পেলে ছাড়তে আছে ?

বলিয়া মাখনবাবু হাতছানি দিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। মাড়োয়ারী ভদ্রলোকও ইহারই জন্য ওৎ পাতিয়া ছিলেন বলিয়া মনে হইল। আমি বলিলাম, আপনারা তা হ'লে কথাবার্তা চালান। আমি প্ল্যাট্‌ফর্মটার খবর নিয়ে আসি একবার। সেই মেয়েটি আবার ফিরে এসেছে, জানেন তো ?

কোন্ মেয়েটি ? সেই মুচীর মেয়ে ?

হ্যাঁ।

কেমন ক'রে জানলেন আপনি ?

পুকুর-ধারে ছিল। আমার সঙ্গেই ফিরে এসেছে, প্ল্যাটফর্মের দিকে গেছে। খবর নিয়ে আসি একবার।

মুচীর মেয়েকে নিয়ে আর অত বেশি মাখামাখি করবেন না। ওসব টেন্‌ডেন্‌সি ছাড়ুন। মরুকগে ও।

না, মাখামাখি করব কেন? আপনি শেঠজীর সঙ্গে ততক্ষণ আলাপ করুন না। আমি এখনই ফিরে আসছি।

শেঠজী আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

মাখনবাবু তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। আমি প্ল্যাট্‌ফর্মের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম।

প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢুকিয়া একটা হাসির হর্‌রা শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম, সেই ছোকরার দল হাসিতেছে। হাসির উপকরণ এবারে তাহারা নিজেরাই সংগ্রহ করিয়াছে। তাহাদের নিজেদের মধ্যেই একজন দেখিলাম ঘোমটা দিয়া বউ সাজিয়া বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে একটি ছোকরা অঙ্গভঙ্গীসহকারে গাহিতেছে—

কাদের কুলের বউ গো তুমি,
কাদের কুলের বউ?

বাকি সকলে হো-হো করিয়া হাসিতেছে।

একটু দূরে একটা গাছতলায় দেখিলাম, সেই ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান দম্পতি বেশ গুছাইয়া বসিয়াছেন। একটা বেতের বাক্স হইতে খাদ্যদ্রব্যাদি বাহির হইয়াছে। পাঁউরুটি, মাখন এবং একটা জ্যামের শিশি—দূর হইতেই বেশ দেখা যাইতেছে। লাল চোঙওয়ালা একটা সস্তা গ্রামোফোনে একটা বিলাতী প্রচলিত গৎ বাজাইয়া তাঁহারা ভোজন-ব্যাপারে ইউরোপীয় আবহাওয়া সৃষ্টিরও প্রয়াস পাইয়াছেন দেখিলাম। কতকগুলি অর্ধনগ্ন গ্রাম্যবালক-বালিকা কিছুদূরে দলবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া এই

ক্রিশ্চান দম্পতির সঙ্গীতময় ভোজনবিলাস সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতেছে।

সেই মেয়েটিও সেখানে গিয়া হাজির হইয়াছে দেখিলাম। ধর্মগত মিল থাকাতে আলাপ-পরিচয়ে বেশ একটা হৃদ্যতা ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

উহাদের নিকট যাওয়া সঙ্গত হইবে কি না চিন্তা করিতেছি, এমন সময় মাখনবাবু ঊর্ধ্বশ্বাসে আসিয়া বলিলেন, একটু তাড়াতাড়ি আসুন সার্। বড় বিপদে পড়েছি, রামদীন ব্যাটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আমাদের এন্‌কোয়্যারিং-অফিসার এখুনি আসছেন ট্রলি ক'রে। ড্রাইভারটারও পাত্তা নেই।

আমি তার কি করব?

আহা, আসুন না আমার সঙ্গে। ওদিকে চা-ও হয়ে গেছে। নিন, একটা সিগ্রেট নিন। মাথা ঠিক রাখুন এ সময়ে। আপনি ঘাবড়ালেই তো গেছি আমরা।—বলিয়া তিনি ফস করিয়া একটা দিয়াশলাই জ্বালাইয়া ধরিলেন, আসুন সার্, চলুন, নো টাইম টু লুজ।

মহা বিপদে পড়িয়াছি এ ভদ্রলোককে লইয়া। অথচ এড়াইবারও উপায় নাই।

গেলাম সঙ্গে।

বাহিরে আসিতেই কনুই দিয়া আমাকে একটা খোঁচা দিয়া মাখনবাবু সহাস্যে বলিলেন, টোপ গিলিতং।

তার মানে?

তার মানে শ্রীমান ড্রাইভারচন্দ্র খুব টেনে বেহুঁস হয়ে প'ড়ে আছেন ওই ওদিককার গুমটির ধারে। আপনার প্ল্যান কোয়াইট সাক্‌সেস্‌ফুল।

রামদীন কোথায় ?

চা করছে, আস্থন।

আপনার স্ত্রী কেমন আছেন ?

বিল্কু অল রাইট। বললাম তো, বউদি যখন গেছেন, তখন নো ফিয়ার।

নিজেকে আবার কেমন যেন অপরাধী মনে হইতে লাগিল। ড্রাইভারটার যদি চাকরি যায়! এ কি ষড়যন্ত্রের মধ্যে নিজেকে অনর্থক জড়াইলাম!

ওদিকে নয় সার্, এদিকে আস্থন। চা হচ্ছে মাস্টার মশায়ের বাসায়।

উভয়ে মাস্টার মহাশয়ের বাসাতে প্রবেশ করিলাম।

## ১১

প্ল্যাট্‌ফর্মের কোলাহলটা যেন হঠাৎ বাড়িয়া উঠিল।

সায়েব এল বোধ হয়।

মাখনবাবু উদ্বিগ্ন মুখে উঠিয়া পড়িলেন।

মাস্টার মহাশয় উর্ধ্বনেত্র হইয়া চক্ষু মিটমিট করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, আপনারা বসুন। আমি দেখে আসি চট ক'রে, ব্যাপারটা কি?

মাখনবাবু বলিলেন, যাবার সময় আপনি রামদীনটাকে একটু পাঠিয়ে দিয়ে যান তো। একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে রাখা দরকার ব্যাটাকে।

আমি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, রামদীন দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ভিতরে যাইতে বলিয়া সোজা প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। প্ল্যাট্‌ফর্মে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল।

দেখিলাম, সেই ক্রিশ্চান মেয়েটিকে ঘিরিয়া আবার সেই অশিষ্ট যুবকদল মহাকলরব শুরু করিয়াছে। আমি আগাইয়া আসিয়া বলিলাম, আবার আপনারা ওঁকে অপমান করছেন?

সেই ট্যারা ছোকরাটি ছিল।

সে আগাইয়া আসিয়া বলিল, কিছু অপমান করি নি মশাই। ভিড়ে যেতে যেতে ওঁর গায়ে আমার একটু গা ঠেকে গিয়েছিল, উনি হঠাৎ আমাকে গালাগালি দিয়ে বলিলেন, ইডিয়ট! আমি বরং ভালভাবে বললাম, দয়াময়ী, রাগ করছ কেন, দয়া কর, দয়া পরম ধর্ম।

বলিয়া ছোকরা ফিক করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল। ছোকরার মুখের হাসির উপরই একটি প্রচণ্ড চড় বসাইয়া দিলাম। আর একটি ছোকরা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, তাহাকেও এক ঘা দিলাম।

ছি ছি, মারামারি করবেন না ওসব ছোটলোকদের সঙ্গে। আস্থন, বাইরে আস্থন।

আমার রুদ্রমূর্তি দেখিয়া ভীরুর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। আরও নানা লোক আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া নানারূপ প্রশ্নে আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। আমি এদিক ওদিক চাহিয়া মেয়েটিকে দেখিতে পাইলাম না। একটু দূরে দেখিলাম, লাল কোট পরিয়া সেই বেঁটে ভদ্রলোকটি আমার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া আরও দুই-তিনজন লোককে কি যেন বলিতেছেন।

আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই তিনি চুপ করিয়া গেলেন এবং মুখে একটা হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, নমস্কার দারোগাবাবু। এবং সরিয়া দাঁড়াইলেন।

মেয়েটি কোন্ দিকে গেল দেখেছেন ?

তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, মেয়েটি গেট দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার পর আমার দিকে পিছন ফিরিয়া বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

পুলিসের লোকের সহিত বেশি বাক্যালাপ করাটা তিনি নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না বোধ হয়।

বাহিরে গেলাম।

বাহিরে গিয়াই মাখনবাবুর সঙ্গে দেখা।

সায়েব এল নাকি ?

না। সেই মেয়েটি কোথা গেল, দেখেছেন ?

হ্যাঁ, সে তো আমার বাসায় গিয়ে ঢুকল ফের। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম মশাই, কিছু বলতে পারলাম না। মহা মুশকিল হ'ল দেখছি, জাত-জন্ম কিছু রইল না।

এমন সময় হঠাৎ তিনজন সাহেব আসিয়া হাজির। একজনের কাঁধে রক্তাক্ত একটা বুড়ী।

এ কি কাণ্ড!

সাহেবেরা প্রথমেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নিকটে কোন ডাক্তার আছে কি না? কাছাকাছি হাসপাতালই বা কতদূর?

মাখনবাবু শশব্যস্ত হইয়া মাস্টার মহাশয়কে ডাকিয়া দিলেন। সাহেবের নাম শুনিয়া মাস্টার মহাশয় তাড়াতাড়ি টুপিটা মাথায় দিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে আসিয়া হাজির হইলেন। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে লাগিলাম।

সাহেবেরা তিনজন সেই ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী। নিকটবর্তী ঝিলে পক্ষী-শিকার করিতে গিয়াছিলেন। এই ঘুঁটে-কুড়ানী বুড়িটা ঝিলের ধারে গোবর কুড়াইয়া বেড়াইতেছিল। এক সাহেবের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বুড়ীকে লাগিয়াছে।

সাহেবেরা মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

স্টেশন-মাস্টারকে বলিতেছেন শুনিলাম, যত টাকাই খরচ হউক না কেন, বুড়ীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

হাসপাতাল কতদূরে?

মাস্টার মহাশয় জানাইলেন, প্রায় মাইল চারেক দূরে একটি সরকারী হাসপাতাল আছে।

সাহেবেরা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কাছাকাছি আর কোন মেডিকেল হেল্‌প পাওয়া সম্ভব কি না? আর কোন ডাক্তার নাই?

মাখনবাবু হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, হিয়ার ইজ ওয়ান মেডিকেল কলেজ স্টুডেণ্ট সার্‌, ভেরি এক্সপার্ট।

আমাকে আগাইয়া আসিতে হইল।

বুড়ীকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম যে, যদিও আঘাত গুরুতর, কিন্তু হাসপাতালে লইয়া গিয়া উপযুক্ত চিকিৎসাদি করিলে বাঁচিয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। বাহিরে ইহার চিকিৎসা হইতে পারে না, বিশেষতঃ এ স্থানে।

এই কথা শুনিবামাত্র একটি কুলিকে সঙ্গে লইয়া সাহেব তিনজন চারমাইল দূরবর্তী হাসপাতাল অভিমুখে পদব্রজে রওনা হইয়া গেলেন। পালকি কিংবা ডুলি না পাওয়া যাওয়াতে বুড়িকে কাঁধে করিয়াই তুলিয়া লইয়া গেলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে মাখনবাবু বলিলেন, দেখলেন শালার ব্যাটাদের কাণ্ড!

মাস্টার মহাশয় ঊর্ধ্বনেত্র মিটমিট করিয়া বলিলেন, পুলিশ-কেস হ'লে আবার সাক্ষী-ফাক্ষি দিতে না হয়! এ এক ভারি হাঙ্গামায় পড়া গেল দেখছি।

এমন সময় স্টেশন-প্ল্যাট্‌ফর্মে আবার একটা কলরব শোনা

গেল। রামদীন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে, ট্রলি করিয়া দুইজন-সাহেব আসিয়াছেন।

মাস্টার মহাশয়ের টুপি পরাই ছিল। তিনি সোজা চলিয়া গেলেন।

মাখনবাবুও পিছু পিছু গেলেন।

আমিও গেলাম।

একজন খাঁটি শ্বেতাঙ্গ, আর একজন ব্রাউন রঙের। তবে ব্রাউন রঙের হইলেও তিনি একজন পদস্থ অফিসার, তাহা মাস্টার মহাশয় ও মাখনবাবুর ব্যবহারে বোঝা গেল।

মাস্টার মহাশয় দেখিলাম হাত কচলাইতেছেন ও ভুল ইংরেজীতে বলিতেছেন যে, দোষ ড্রাইভারের। সে লোকটা মাতাল অবস্থায় সিগ্‌ন্যাল অগ্রাহ্য করিয়া ফুল ফোর্সে স্টেশনে ট্রেন ইন করাইয়াছিল।

শ্বেতাঙ্গ সাহেবটি মুখ হইতে পাইপ নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন যাত্রী জখম হইয়াছে কি না? হয় নাই শুনিয়া নিশ্চিন্ত মনে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ড্রাইভার কোথায়?

মাখনবাবু বলিলেন, সে মত্ত অবস্থায় গুমটির ধারের রাস্তায় শুইয়া আছে। ট্রেন ডিরেল্ড হইবার পর সে ক্রমাগত মদ খাইতেছে।

সাহেব বলিলেন, লেট আস সি হিম।

সকলে অগ্রসর হইলাম।

গেট হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে মাখনবাবুর বাসা হইতে সেই খ্রীষ্টান মেয়েটি বাহির হইয়া সানন্দে বলিয়া উঠিল, হ্যালো পল, ইউ আর হিয়ার! বাই গড! হ্যাভ ইউ বিন ট্র্যান্সফার্ড?

মার্থা! হোয়াট ব্রিংস ইউ হিয়ার?

আই ওয়াজ অন মাই ওয়ে টু ইউ।

ব্রাউন রঙের সাহেবটি সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

মার্থা তখন আসিয়া সোচ্ছ্বাসে বর্ণনা করিতে লাগিল যে, তাঁহাকে আশ্চর্য করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে কোন খবর না দিয়াই তাহার কাছে যাইতেছিল। হঠাৎ পথে এই বিপদ।

তাহার পর তাহারা গল্প করিতে করিতে আগাইয়া গেল। তাহাদের কথাবার্তা আর শুনিতে পাইলাম না। শ্বেতাঙ্গ সাহেবটিও দেখিলাম সহাস্যমুখে হ্যাটটা একটু খুলিয়া মার্থাকে অভিবাদন করিলেন।

মাখনবাবু চুপি চুপি আমার কানে কানে বলিলেন, সারলে দেখছি সার্! ওই সাহেব হচ্ছে পি. ডব্লিউ. আই.। এ মেয়েটার সঙ্গে বেশ ভাব আছে দেখছি। মাগী আমাদের নামে না লাগায়! আমি কোন উত্তর দিলাম না।

আমার কিছু ভাল লাগিতেছিল না।

গুমটির নিকট পৌঁছিয়া দেখা গেল, ড্রাইভার রাস্তার ধারে শুইয়া আছে। পাশে একটা মদের বোতলও রহিয়াছে। তাহার একজন অর্ধমত্ত সঙ্গী তাহার নিকট বসিয়া তাহাকে উঠাইবার

বৃথা চেষ্টা করিতেছে। ড্রাইভার কিন্তু বেহুঁশ। শুধু বিড়বিড় করিয়া কি বকিতেছে।

কাছেই একটা ঝোপের ধারে দেখিলাম, সেই ফুটফুটে বেণীদোলানো মেয়েটি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া একটা প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সহসা এতগুলি লোকের সমাগমে সে অন্যমনস্ক হইয়া গেল, প্রজাপতি উড়িয়া গেল।

সাহেবেরা গিয়া ড্রাইভারকে দেখিতে লাগিলেন। ভাঙা হিন্দীতে শ্বেতাঙ্গ সাহেবটি ড্রাইভারের সঙ্গীটিকে প্রশ্ন করিলেন, ড্রাইভার কখন হইতে মদ খাইতেছে? সে সত্য কথাই বলিল। সে বলিল, এখানে ট্রেন ডিরেল্ড হইবার পর তবে তাহারা মদ খাইয়াছে। স্টেশনের পয়েণ্টস্‌ম্যান রামদীন সাক্ষী আছে।

স্টেশন-মাস্টার চক্ষু মিটমিট করিয়া ইংরেজীতে বলিলেন, অল্‌ ফল্‌স্‌।

অবিশ্বাস করিবার কিছু ছিল না।

হঠাৎ সেই ব্রাউন রঙের সাহেবটি মাখনবাবু ও আমার দিকে ফিরিয়া ইংরেজীতে বলিলেন, এই বিপদে আমরা তাঁহার বাগ্‌দত্তা পত্নীর প্রতি যে সদ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহার জন্য তিনি আমাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ওই মেয়েটি ইঁহার বাগ্‌দত্তা পত্নী!

মাখনবাবুর চক্ষু কপালে উঠিল।

তিনি ও মাস্টার মহাশয় উভয়েই নত হইয়া এখন তাহাকে সেলাম করিলেন।

সাহেবেরা কার্য শেষ করিয়া আবার স্টেশনের দিকে ফিরিলেন। আমার আর স্টেশনে ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। মাখনবাবুকে বলিলাম, আমি একটু বেড়িয়ে আসি। আপনারা যান।

সকলে চলিয়া গেলে আমি ড্রাইভারের সেই মুসলমান সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওই সবুজ ওড়না-পড়া মেয়েটি কাহার? মেয়েটি দেখিলাম, একটু দূরে আবার প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটি বলিল, মেয়েটি এই ড্রাইভারেরই মা-মরা মেয়ে। বাপ যখন যেখানে যায়, প্রায়ই মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

সংবাদটা শুনিয়া কেমন যেন হইয়া গেলাম। অজ্ঞাতসারে ইহার কি সর্বনাশটাই করিয়াছি! একবার ভাবিলাম, সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিই। কিন্তু মাখনবাবুর কথা স্মরণ করিয়া তাহা পারিলাম না।

অন্যমনস্কভাবে মাঠের দিকে অগ্রসর হইলাম।

## ১২

কতক্ষণ হাঁটিয়াছিলাম খেয়াল ছিল না। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এক নিস্তব্ধ প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। জটিল শাখা-প্রশাখাময় বিরাট কি একটা

গাছ দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র তাহার আড়ালে উঠিতেছে দেখিতে পাইলাম। কোথাও একটু বসিতে পাইলে যেন বাঁচিতাম।

পা দুইটা ব্যথা করিতেছিল।

ধীরে ধীরে গাছটার দিকেই অগ্রসর হইলাম। গাছের নিকটবর্তী হইতেই তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে অন্ধকারকে চিরিয়া একটা শকুনি ডাকিয়া উঠিল। ডানার ঝটপট শুনিয়া বুঝিলাম, এই গাছেই বোধ হয় শকুনিদের বাসা আছে।

দূরে কোথায় একটা ফেউ ডাকিতে লাগিল। গাছটার ও-পাশে গিয়া দেখি, একটা উঁচুমত ঢিবি রহিয়াছে। তাহাতেই উঠিয়া বসিলাম। উঠিয়া বসিয়া পূর্ব দিগন্তে চাহিয়া রহিলাম। চাঁদ উঠিতেছে। আকাশে মেঘের চিহ্ন নাই। ফাঁকা মাঠে ঝিরঝির করিয়া সুন্দর বাতাস বহিতেছে।

একটু ভয়-ভয় করিতেছিল। তবু কিন্তু ভালই লাগিতেছিল। চাঁদ আর একটু উঠিলে দেখিতে পাইলাম, একটু দূরে একটা ছোট নদীও রহিয়াছে। ঢিবি হইতে নামিয়া সেই দিকেই গেলাম। শীর্ণস্রোতা নদীটির উপর ক্ষীণ জ্যোৎস্না পড়িয়া সেই নির্জন প্রান্তরে এমন একটা শোভার সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

সেই নদীর ধারেই একটি ফাঁকা জায়গা বাছিয়া বসিলাম। হঠাৎ সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাণ্ড উল্কাপাত হইয়া গেল। সমস্ত মাঠটা আলোকিত হইয়া উঠিল।

সমস্ত দিনের অবসাদে শরীর মন ক্লান্ত। মাঠের মাঝে হাওয়াটুকু বেশ মিষ্ট লাগিতেছিল। লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

ভাবিলাম, একটু বিশ্রাম করিয়া স্টেশনের দিকে যাওয়া যাইবে।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে চাহিয়া দেখি, একটু দূরে দাউদাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। কাছেই কতকগুলি লোক বসিয়া আছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম।

লোকগুলির নিকটে গেলাম।

ইহারা মড়া পোড়াইতেছে। যাহা জ্বলিতেছে, তাহা চিতা। আমি এতক্ষণ শ্মশানে শুইয়া ছিলাম!

রাত্রি কত হইয়াছে?

একজন বলিল, বারোটা হবে।

বারোটা?

স্টেশনের দিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইলাম।

স্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি, চারিদিক নিস্তব্ধ। মাখনবাবু বসিয়া টেলিগ্রাফ-যন্ত্রে টক্কা-টরে করিতেছেন। সমস্ত যাত্রীদের লইয়া ট্রেন চলিয়া গিয়াছে।

একজনও নাই।

আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যাহাদের লইয়া সমস্ত দিন এত উৎসাহে এত আগ্রহে এত সত্যমিথ্যার জাল

বুনিতেছিলাম, তাহারা অতর্কিতে এমন করিয়া ফেলিয়া গেল! আর জীবনে দেখা হইবে না!

ধীরে ধীরে মাখনবাবুর কাছে গেলাম

মাখনবাবু বলিলেন, অনেকক্ষণ আপনি বেড়ালেন তো সার্? আপনারও ট্রেন এল ব'লে। সিগন্যাল দিয়েছে। আপনার জন্যে রুটি করিয়ে রেখেছি। খাবেন কি? সময় কিন্তু নেই।

থাক্, দরকার নেই।

আচ্ছা, ওয়েট এ মিনিট, আপনার সঙ্গে খাবারগুলো বেঁধে দিই না হয়।

শশব্যস্ত হইয়া মাখনবাবু চলিয়া গেলেন। আমি একা নির্জন প্ল্যাট্‌ফর্মে সিগন্যালটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ওই ট্রেন আসিতেছে। একটু পরেই আমিও আর এখানে থাকিব না।

॥ শেষ ॥